আশ্রিতা

সায়ফুল্লাহ বিন কাসেম

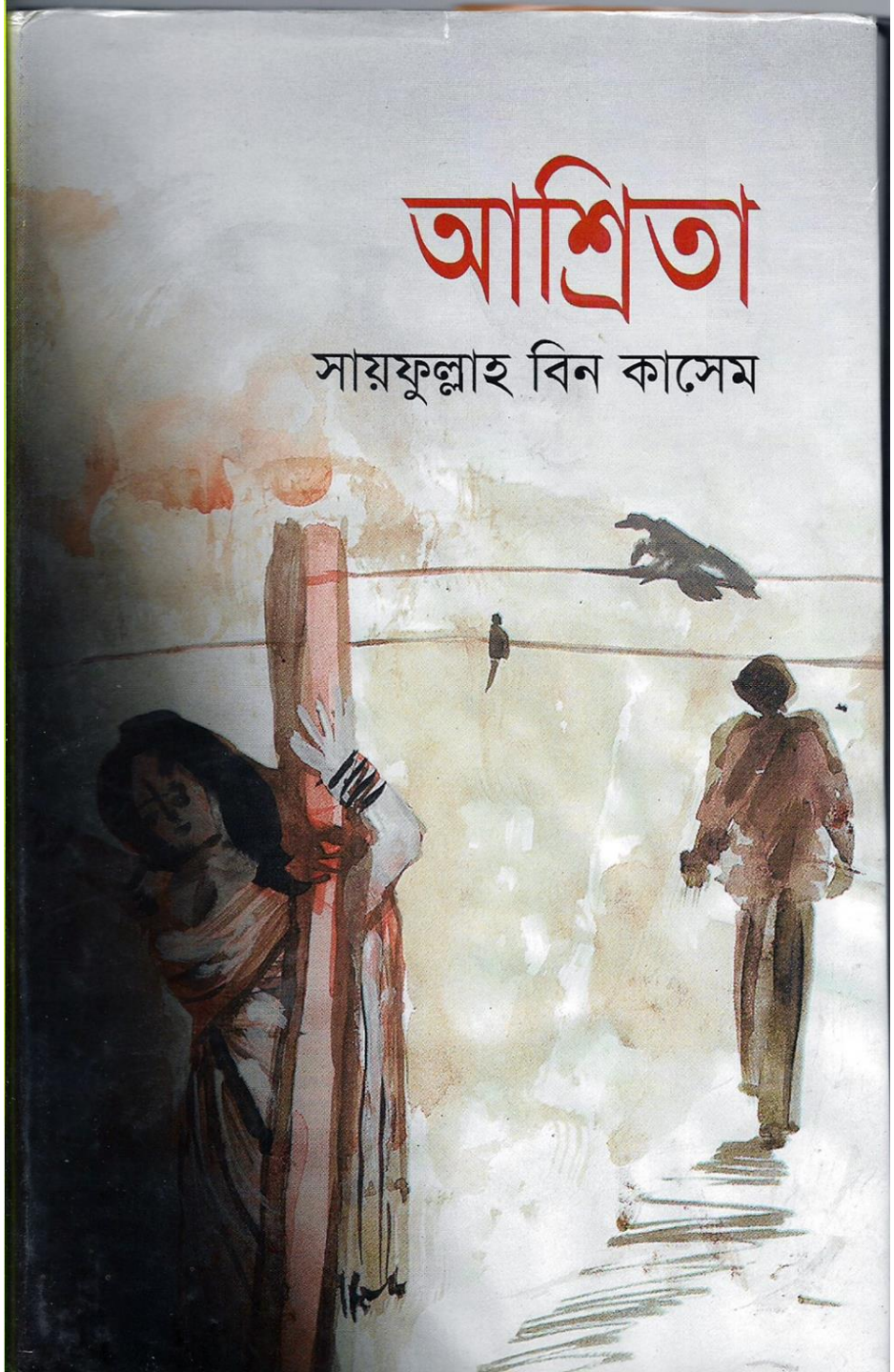

নিশ্চয়ই মুমিনরাই সাফল্য লাভ করলো, যারা নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

–সূরা আল মুমিন।

যে ব্যক্তি নীরবতা অবলম্বন করেছে সে নাজাত পেয়েছে।

–তিরমিজী।

মূর্খতার চেয়ে বড় পাপ আর নেই।

–সহল ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:)

সাংসারিক কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে দেওয়ালে টানানো ঘড়িটার দিকে বার বার তাকাচ্ছে, রুমানা। সেই সকাল ভোরে ফজরের নামাজ শেষ করে সংসারের কাজে লেগেছে এখন বেলা বললে ভুল বলা হবে। ঘড়ির সময় মত দুপুর বারোটা পনের। তারপরও সংসারের কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর নয়নের মনি স্নেহা ও নেহা স্কুল থেকে এসে পড়বে। আর ওরা এসে যদি দেখে ও এখনো গোসল, নামাজ শেষ করেনি তাহলে আর ওদের দুই বোনের বকুনি থেকে নিজের রক্ষা নেই।

সংসারের কাজে ওকে সহযোগিতা করার জন্য স্বামী সোহানুর রহমান মাঝ বয়সি একজন কাজের মহিলা, একজন হাউস সারভেন্ট এবং একজন কেয়ারটেকার ঠিক করে দিয়েছে। এতেই মোটামুটি রুমানার হয়ে যায়। ওদের চারজনের সংসারে কাজকর্ম আসলে তেমন একটা নেই।

মেয়েরা বড় হওয়ার পর অর্থাৎ ওর কাজকর্মে ও স্বভাবে কিছুটা পরিবর্তন রুমানা নিজেই লক্ষ্য করেছে। বিশেষ করে মেয়েরা যখন থেকে ওর কাজকর্মের ব্যাপারে নিজেদের মতামত দিতে শুরু করেছে।

ইদানিং রুমানার মনে হয়, ও নিজের মেয়ে দুটো স্নেহা ও নেহাকে কিছুটা নয় বেশ ভয় পায়। আসলে এটা ভয় না মাতৃস্নেহ তা নিয়ে রুমানার চিন্তা করার এখন ফুসরত নেই। আবার দেয়ালে টানানো ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি ফেলল। একটা পয়ত্রিশ বাজে। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে গোসলের জন্য ঢুকে পড়ল। তারপর আবার নামাজের পালা।

এত কিছুর পরও রুমানার সংসার জীবন ভালোই লাগে। শত হলেও এটা ওর নিজের সংসার। এখানে কারো কাছে জবাবদিহিতা করতে হয় না। স্বামী সোহান ছাড়া কাওকে সমিহ করে চলতে হয় না। শ্বশুর শাশুড়ি যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁদের সমিহ করে চলেছে। শাশুড়ির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সোহান ওকে বিয়ে করেছিল বলে দীর্ঘ সাত বছর ওদেরকে ভাড়া বাসায় আলাদা থাকতে হয়েছে। স্বামী সোহান সে সময় বাবার ব্যবসা বাদ দিয়ে

অন্য জায়গায় চাকুরি করে সংসার চালিয়েছে। সোহান প্রথম জীবনে চাকরি করলেও তিন চার বছরের মাথায় মোটামুটি বড় না হলেও মাঝারি ধরনের একজন ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে। বিয়ের দ্বিতীয় বছর স্নেহার জন্ম। এরপর থেকেই যেন সোহানের ভাগ্যের চাকা দ্রুত ঘুরতে থাকে। এক বছরে দু'দুটো প্রমোশন পেয়ে যায়। তারপরের বছর থেকে চাকরির সঙ্গে আস্তে আস্তে নিজেকে ব্যবসায় জড়াতে থাকে। দু'বছর না যেতেই নেহা আসে ওদের সংসারে। পরপর দুটো সন্তানই মেয়ে হতে প্রথম প্রথম সোহানের মন খারাপ হলেও পরবর্তীতে দেখল, নেহার জন্মের তিন মাসের মাথায় একটা বড় ব্যবসা পেয়ে গেল। সেই বারের ব্যবসায় বেশ মোটা অংকের টাকা লাভ হলো। তার পরপরই চাকরি ছেড়ে পুরো দস্তুর ব্যবসায়ী হয়ে গেল। কারো কোনো সাহায্য ছাড়াই কিছু দিনের মধ্যে ঢাকায় একটা অভিজাত এলাকায় তিন কাঠা জায়গার উপর সুন্দর একটা চারতলা বাড়ি করেছে। দু'বছর না যেতে একটা গাড়িও কিনেছে। বর্তমানে ওদের চারজনের সংসারে ওরা বেশ সুখেই আছে।

মেয়ে দু'টোর জন্মের পর নিজের জীবনের চাকার পরিবর্তন দেখে সোহান রুমানার কাছে প্রায় আবদার করত আর একটা সন্তান নেয়ার জন্য এবং সেই সঙ্গে বলত, তুমি ভেবনা তোমার কাছে আমি তৃতীয় সন্তান ছেলে চাচ্ছি। আমার তৃতীয় সন্তান ছেলের বদলে মেয়ে হলেই বরং আমি বেশি খুশি হব। কারণ আমি হাদিস পড়ে জেনেছি, "যার একটা মেয়ে সন্তান জন্মালো সে যেন একটা বেহেশ কিনল।" অতএব আমি এ পর্যন্ত দুটো বেহেশতের মালিক যেমন হয়েছি তেমনি আল্লাহ দুনিয়ায় আমাকে তেমনি অর্থ, সম্পদ ও প্রতিপত্তিও দিচ্ছেন। অতএব, আমি এ থেকে কেন নিজেকে বঞ্চিত করব।

আমি চিন্তা করেছি, যেহেতু আল্লাহ আমাকে ওদের বদৌলতে আমার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অর্থ সম্পদ দিয়েছেন তাই আমিও চাই সেই অর্থ সম্পদ দিয়ে আমার প্রতিটা সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে সমাজে দাঁড় করাব। যাতে ওদের দ্বারা সমাজের ও দেশের গরিব অসহায় মানুষের উপকার হয়।

স্বামীর অর্থাৎ সোহানের উঁচু মনের পরিচয় দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই পেয়েছে রুমানা। তখন ভেবেছিল হয়তো বয়সের কারনে, যৌবনের আবেগে সে নিজের জীবনের সঙ্গে একটা চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে। আজ আবার সোহানের মুখে সেই আগের কথার প্রতিধ্বনি শুনে রুমানা মনে মনে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বলল,

"হে পরম করুণাময়, তোমার দরবারে শুকরিয়া জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। শুধু বলব, যতদিন এই হতভাগীকে জীবিত অবস্থায় রাখ আমি যেন ততদিন এই মহান মানুষটার মনে কোনো কষ্ট না দিই এবং আমি যেন তাঁর মন যুগিয়ে চলে তাকে সুখি ও খুশি রাখতে পারি। যেমন ও আমাকে রেখেছে। তুমি আমাকে সেই তৌফিক দান কর।"

সোহান শুধু স্বামীই নয় ও একজন মানুষ হিসেবেও অতুলনীয়। রুমানার দেখা এই ছোট্ট জীবনে এমন মানুষ ও দ্বিতীয়টি আজ পর্যন্ত দেখেনি। এরকম মানুষের কথা শুধু বইয়ের পাতায় ছাপার অক্ষরে লেখায় পাওয়া যায়। বাস্তবে এর দেখা পাওয়া পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। রুমানা নিজেকে সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন মনে করে মনে শান্তি পায়।

এরপরও প্রায়ই মানুষটাকে নিয়ে ভাবে রুমানা। মানুষটার হৃদয়ের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। কথা একদম কম বলে। প্রয়োজন ছাড়া কথা যেন তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না। প্রয়োজনের খাতিরে যতটুকু বেরোয় সেই কম কথায় কোমলতা আছে। আছে নান্দনিকতা। আরো আছে কথার সঙ্গে মন ভুলানো মিষ্টি হাসি।

নিজের ভালোবাসার সম্মান দিতে রুমানার সেই দুর্বিষহ জীবনটাকে নিজের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে সুখে, আনন্দে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলেছে। ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তে দু'গাল বেয়ে অশ্রু ধারা গড়িয়ে পড়ে। বাথরুমে গিয়ে কল ছেড়ে দিয়ে প্রাণ খুলে কাঁদে রুমানা। অথচ ওর জীবনে এমন এক সময় ছিল যখন কাঁদার মত জায়গাও ওর ছিল না। এখন তো রুমানার সুখের সংসার কিন্তু কাঁন্না যে ওর জীবনসঙ্গি। তাই তো স্বামী সন্তানদের অগচরে প্রায় কাঁদে।

গোসল শেষ করে ভিজে কাপড়গুলো বারান্দায় মেলে দিয়ে ভিজে চুল শুকানোর জন্য গামছা দিয়ে ঝাড়তে লাগল আর বারান্দার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে রাস্তার দিকে বার বার তাকাতে লাগল। এই বুঝি দুই দস্যুরাণী এসে হাজির হলো।

এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠতে কে হতে পারে ভাবতে ভাবতে গিয়ে গেট খুলে অবাক দৃষ্টিতে বলল, তোরা! তোরা কখন আসলি? কোন দিক দিয়ে আসলি?

খিল খিল করে হেসে উঠে দু'বোন স্নেহা ও নেহা এক সঙ্গে বলে উঠল, কেন, অন্য কাউকে আশা করেছিলে না কি?

মেয়েদের পাল্টা প্রশ্নে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে রুমানা বলল, তার মানে!

মানে আবার কি? তুমি তোমার প্রেমিকের অপেক্ষাতেও থাকতে পার। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাটা বলল নেহা।

নেহার কথাশুনে রুমানা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। রুমানা বেশ অনুভব করতে পারছে ওর কান দিয়ে যেন গরম ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নিজের অজান্তে কানের লতি স্পর্শ করল। হ্যাঁ কানের লতি গরম থেকে ক্রমর্শ আরো গরম হয়ে উঠছে। নেহার মুখে একী শুনল ও:

নেহার কথা শুনে মাকে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে দেখে দু'বোনে চোখাচোখি করে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসি থামিয়ে নেহা বলল, দেখ বুবু দেখ, মার অবস্থা দেখ, মনে হচ্ছে যেন চিন্তার গহ্বরে পড়ে গেছে। কথা শেষ করে ব্যাগটা সোফায় ফিকে দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে দু'গালে পরপর ক'টা চুমু দিয়ে বলল, আরে বাবা এতো কি চিন্তা করছ? আমার প্রশ্নের উত্তর তো একে বারে সোজা।

উত্তরটা হলো এই রকম–হ্যাঁ অবশ্যই আমি আমার প্রেমিকের জন্য অপেক্ষায় থাকতেই পারি। তবে তার সময় এখন নয় বিকেলে।

আবারও অবাক হয়ে বিস্ময় ভরা চোখে রুমানা বলল, বিকেলে মানে!

স্নেহা জানে ওর মা আজকালকার আর দশটা মার মত না। তার জগতটা খুবই ছোট। নিজের সংসার আর মার পালক চাচা চাচির মধ্যেই সিমাবদ্ধ। এর বাইরের মানুষ বা জগতটা তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। আর মনের দিক দিয়ে এতটাই সরল যে, যে যাই বলুক তাই বিশ্বাস করে ফেলে।

শেষে মাকে ব্যাপারটা খোলাসা করে বোঝানোর জন্য স্নেহা বলল, মা তুমি নেহার কথায় ভড়কে গেলে? কেন, বাবা কি তোমার প্রেমিক নয়? তুমি কি প্রতিদিন তার ফেরার অপেক্ষায় থাক না?

এতক্ষণে মেয়েদের কথার অর্থ বুঝতে পেরে রুমানা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, তবে রে দুষ্টরা। মাকে বোকাবানিয়ে মজা নিচ্ছ। বলে দু'জনের কান ধরে মৃদু টান দিয়ে বলল, বল আর কখনো করবি?

দু'জনেই এক সঙ্গে দু'হাত জোড় করে বলে উঠল, তিন সত্যি করছি। জীবনে আর কখনো করব না।

মনে থাকবে?

হাজার বার থাকবে।

কান ছেড়ে দিয়ে মুখে হাসি টেনে রুমানা বলল, তোরা কোন দিক দিয়ে

আসলি? আমি তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। তোদের আসতে তো কই দেখলাম না।

বারে আমরা তো অন্য রাস্তা দিয়ে বাসায় এসেছি। তুমি দেখবে কিভাবে? কথা শেষ করে নেহা খিলখিল করে হেসে উঠল।

হয়েছে হয়েছে তোমরা আমার বাহাদুর মেয়ে। বলি এমনটা করার কারণটা জানতে পারি?

স্নেহা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, তোমাকে চমকে দিতে।

বুদ্ধিটা কার জানতে পারি?

স্নেহা মুখে কিছু না বলে হাত তুলে নেহাকে দেখাল।

তাই নাকি! আশ্চর্য ভঙ্গিতে নেহার দিকে তাকিয়ে রুমানা মিটিমিটি হেসে বলল।

নেহা মৃদু প্রতিবাদ করে বলল, না আম্মু আপুই আগে বলেছে। আমি শুধু ওর মতের সঙ্গে একাত্ততা জানিয়েছি। কথা শেষ করে তিন জনে এক সঙ্গে হেসে উঠল।

হাসি থামিয়ে রুমানা উভয়ের উদ্দেশ্যে বলল, হয়েছে হয়েছে ঢের হয়েছে। তোমাদের চিন্তে আমার বাকি নেই। দু'জনেই চোরে চোরে মাস্তুত ভাই।

এবার দয়া করে যার যার রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে এসে আমাকে উদ্ধার কর।

মার কথা শুনে দুই বোন এক সঙ্গে বলে উঠল, তারমানে তুমি আজ আমাদের ফেরার আগেই সব কাজ শেষ করে ফেলেছ?

ঠোটের কোণে হাসি টেনে রুমানা শিশু সুলভ ভঙ্গিতে বলল, জি হ্যাঁ।

দুই বোন এক সঙ্গে দৌড়ে এসে রুমানার দু'গালে চুমু খেয়ে বলল, এই তো আমাদের মা গুড মা হয়ে গেছে। তারপর দু'জনে যার যার রুমের দিকে চলে গেল।

সোহান সেই সকাল আটটায় বেরিয়েছে। বাসায় ফিরতে ফিরতে পাঁচটা। কখনো কখনো সন্ধা সাতটা বেজে যায়। প্রতিদিন এমন সময়টায় রুমানা সোহানের জন্য অপেক্ষায় থাকে। সোহানকে ছাড়া প্রায় প্রতিদিন দুপুরের খাবার খেতে হয়। তবুও রুমানা কেন জানি মুখে খাবার তুলতে পারে না। খালি মনে হয়, মানুষটা কাজের চাপে হয়তো এখন পর্যন্ত খায়নি। খেলেও কি খেল না খেল তাই ভেবে নিজেও খেতে পারে না। এই সব ভেবে সোহানের জন্য হাহাকার করে উঠে রুমানার হৃদয়টা। সেই সকাল আটটায় বেরিয়ে গেছে মানুষটা। সেই মানুষটাকে ফেলে কী করে খাবার মুখে তুলবে রুমানা। প্রথম প্রথম একদমই খেতে পারত না।

এই না খাওয়ার জন্য কত যে বকা খেয়েছে সোহানের কাছে তার হিসাব নেই। তবুও রুমানা না খেয়ে অপেক্ষায় বসে থেকেছে। এখন মেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে, এখনো প্রায় দিন না খেয়ে সোহানের সঙ্গে এক সঙ্গে খাবার জন্য অপেক্ষায় থাকে।

কলিংবেলের আওয়াজে বাস্তবে ফিরে রুমানা দরজার দিকে দ্রুত হেঁটে যায়।

রুমানা দরজা খুলে দিতে সোহান সালাম দিয়ে ভিতরে ঢুকে ব্রিফকেসটা রুমানার হাতে দিয়ে এক দৃষ্টে রুমানার ব্যাকুল চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকল। কেমন সুন্দর মায়া জড়ান চোখ দুটো। ওখানে শুধু সোহান সোহান সোহানেরই অবস্থান। ওই দৃষ্টি আর কিছুই দেখতে পায় না। আর কিছু ভাবতে পারে না। ওর কাছে আসলে, ওকে দেখলে সারাদিনের কর্ম ক্লান্তি নিমিশেই কোথায় যেন হারিয়ে যায়। মনে অনুভব করে পরম শান্তি। ফিরে প্রায় প্রশান্তি।

রুমানা ব্রিফকেসটা হাতে দিয়ে সোহানকে এক দৃষ্টিতে ওভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জা পায়। মনে মনে অনুভব করে প্রেমিক তার সুধা পান করছে নিরবে চুপিসারে। লজ্জায় জড়সড় হয়ে জিজ্ঞেস করল, ওভাবে কি দেখছ?

তোমাকে।

কোথায়!

তোমার ভিতর।

কেন? সেই আমি কি এই আমি নই?

জানি না।

কেন?

প্রতিদিন যখনই আমি তোমার কাছে আসি বা তোমাকে দেখি তখনই মনে হয়, এই প্রথম দেখছি।

কথাটা শুনে রুমানা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। লজ্জাবতির ন্যায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ঢলে পড়ল সোহানের বুকে। দু'চোখ বেয়ে অঝর ধারা গড়িয়ে পড়ল রুমানার গাল বেয়ে।

এভাবে কয়েক মুহূর্ত অতিবাহিত হওয়ার পর সোহান একটা হাত দিয়ে রুমানার চিবুকটা তুলে ধরে ভালোবাসাময় কণ্ঠে বলল, বেগম সাহেবা, দুপুরে আপনার খাওয়া হয়েছিল?

রুমানা জানে সত্য কথা বললে এই ভালোবাসার মুহূর্তেও সোহানের কাছে বকা খেতে হবে। উত্তরে কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

রুমানাকে দৃষ্টি নিচু করে চুপ হয়ে থাকতে দেখে সোহান বলল, আজও তাহলে খাওনি?

মুখে কিছু না বলে রুমানা শুধু মাথা নেড়ে না সূচক উত্তর দিল।

দরজাটা লাগিয়ে রুমানাকে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে নিজের মুখটা একেবারে রুমানার মুখের কাছে নিয়ে বলল, এজন্য এখন কি করতে মন চাচ্ছে জান?

কি?

তোমার ঠোটে কামড় দিয়ে রক্তাক্ত করতে। কথা শেষ করে যেই রুমানার ঠোটে নিজের ঠোট ছোঁয়াতে গেল।

অমনি রুমানা একটা হাত দিয়ে সোহান ও নিজের মুখের মাঝখানে প্রতিরোধ প্রাচীর তৈরী করে মুখে কপট রাগের হাসিটেনে বলল, খবরদার। মেয়েরা বড় হয়েছে। ওরা দেখে ফেলবে।

দেখুকগে। আমি কী পর মেয়ে মানুষের সঙ্গে কিছু করছি?

তা না হোক। তাই বলে...।

রুমানাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সোহান আবার বলল, অত কিছু

বুঝি না। আমার এখন মন চাইছে তোমার ঠোটে কামড় দিতে আমি কামড় দিব।

কথা শেষ করে সোহান যেই রুমানার হাতটা সরাতে গেল অমনি রুমানা চড়ই পাখির মতো ফ্রুত করে ছুটে নিজের রুমের দিকে পালিয়ে গেল।

সোহানও চারপাশ একবার দেখে নিয়ে দ্রুত রুমানার পথ অনুসরণ করে রুমে ঢুকে ভিতর দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল।

পৃথিবীতে আল্লাহ বেহেশতের যে কটা সুধা মানুষকে উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন তার অন্যতম হলো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসাময় মধুর মিলন। সোহান ও রুমানা আনন্দঘন মধুর মুহূর্তগুলো কাটিয়ে ঘর্মাক্ত শরীরে সোহান ফ্যানের স্প্রীড বাড়িয়ে দিয়ে খাটে হেলান দিয়ে শুয়ে রইল। রুমানাও সোহানের বুকে মাথা গুঁজে দিয়ে পরম শান্তিতে শুয়ে রইল।

সোহান রুমানার চুলে বিনি কেটে দিতে দিতে বলল, আমার অনুরোধ রইল তুমি ঠিক সময় মত খাওয়া দাওয়াটা করে। তা না হলে কিন্তু শরীর আবার খারাপ করবে। এখন আমি বকছি তখন কিন্তু ডাক্তারের বকাও খেতে হবে এবং নিজেকেও অসুখে ভুগতে হবে। তাছাড়া আমার জন্য তুমি কেন অভুক্ত থাক? আমি তো প্রতিদিনই লাঞ্চের সময় অফিসে কিছু না কিছু খাই।

কিন্তু আমি, আমি..., রুমানা আর কিছু বলতে পারে না। সোহানের বুকে মাথা গুঁজে ডুকরে উঠে।

মৃদু ধমক দিয়ে সোহান বলল, কাল থেকে যদি তোমার রুটিন পরিবর্তন না কর তাহলে কিন্তু আমিও অফিস থেকে অসময়ে বাড়ি ফিরব। কথাটা যেন মনে থাকে। ভেবনা যেন, এটা আমার কথার কথা।

তারপর রুমানার মাথাটা দু'হাতে তুলে ধরে কপালে একটা সোহাগ চুমু একে দিয়ে আবার বলল, কি মনে থাকবে তো?

রুমানা চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল, থাকবে। তারপর বলল, আমি বাথরুমে যাচ্ছি, তুমি একটু বিশ্রাম নাও। আমি বেরোলে তুমিও কাজ সেরে ফ্রেশ হয়ে একেবারে ডাইনিংয়ে চলে এসো।

সোহান বলল, আজ কি রান্না করেছ?

তুমার পছন্দের তরকারি রান্না করেছি। বলেই মিষ্টি হাসি হাসল রুমানা।

একটু সময় কী যেন চিন্তা করে নিয়ে সোহান বলল, নিশ্চয় শর্সে ইলিশ?

সঙ্গে আরো আছে। দেখি বলতে পার কী না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সোহান বলল, গরুর গোস্তের রেজালা?

য়ুঁ...হু হলো না।

কৌতূহল দৃষ্টিতে সোহান বলল, তাহলে কি?

চিংড়ি মাছের মাথার কোর্মা।

খুশিতে লাফিয়ে উঠে সোহান বলল, তাই! তাহলে আজকের খাওয়াটা মজা করে খাওয়া যাবে। পরমুহূর্তে আবার বলল, আচ্ছা মেয়েদের দেখছি না। ওরা কোথায়?

ওরা খেয়ে রেস্ট নিচ্ছে। কথা শেষ করে রুমানা কাপড় নিয়ে বার্থরুমে ঢুকে পড়ল।

রাতে খেতে বসে নিজের পছন্দের খাবারগুলো দেখে সোহান বলল, রুমানা জান বড় বড় মাছ, গোস্ত রেখে আমার এসব তরকারীতে আসক্তি দেখে প্রায়ই বাবা বকাবাদ্দ করত। তাই শুনে মা শুধু হাসত। বাবা বলত, "আল্লাহ পাক মানুষের জন্য যা যা খাবার উপকারি মনে করেছেন সেগুলোই হালাল করেছেন।" অর্থাৎ মানুষকে খাবার জন্য বলেছেন।

টেবিলে রাখা খাবারগুলো দেখিয়ে নেহা বলল, আব্বু তাহলে কি আল্লাহ এগুলো খেতে নিষেধ করেছেন?

না, আমি তা তো বলিনি। আল্লাহ প্রতিটা হালাল খাবারের মধ্যে মানুষের শরীরের জন্য উপকারি আলাদা আলাদা গুণ রেখেছেন।

নেহা বলল, তাহলে দাদু ভাই কেন তোমাকে বকতো? দাদু কি জানতেন না যে, বড় বড় মাছ থেকে ছোট মাছ মানুষের জন্য বেশি উপকারি। এই যেমন মলাডেলা খেলে রাতকানা হয় না।

মুখে মিষ্টি হাসি টেনে সোহান বলল, তা অবশ্যই জানতেন। কিন্তু ঘটনা তো অন্য জায়গায় মা।

কৌতূহল দৃষ্টিতে দু'বোন একসঙ্গে বলে উঠল, সেটা আবার কি?

সোহান কিছু বলতে যাচ্ছিল। ওকে থামিয়ে দিয়ে রুমানা বলল, আমি বলছি শোন, তোমার বাবা ছোট মাছ ছাড়া বড় তো দূরের কথা কোনো মাছই খেত না। সেই সঙ্গে কোনো প্রকার গোস্তও খেত না।

অবাক বিস্ময়ে দু'বোন আবার বলে উঠল, কই আব্বুকে তো কখনো দেখলাম না খেতে বসে এটা খাবনা সেটা খাবনা বলতে।

সোহান বলল, তার আগে বলতো, তোমরা নিজেরা কখনো খেতে বসে এটা খাবনা সেটা খাবনা বলেছ?

একটু চিন্তা করে নিয়ে দু'বোনই এক সঙ্গে বলে উঠল, না। বলেছি বলে মনে পড়ছে না।

তোমাদের ওই বদ অভ্যাসটা কে হতে দেয়নি যান? সোহান দু'মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলল।

দু'জনেই বলল, মা।

উত্তর শুনে সোহান হেসে ফেলে বলল, জি, তোমাদের মাই-ই তোমাদের মধ্যে ওই বদ অভ্যাসকে বাসা বাঁধতে দেয় নি। আর আমার মধ্যে ওই বদ অভ্যাসের যে বাসা ছিল তা তোমাদের মা বিয়ের পর আমার অজান্তেই কবে যেন দূর করে দিয়েছে।

সোহান কথা শেষ করতে নেহা রুমানার দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমি মাখা কণ্ঠে বলল, কি মা, আব্বু যা বলল তার সব সত্যি?

রুমানা ঠোঁটের কোনে হাসি টেনে বলল, তোদের কি তাই মনে হয়?

স্নেহা প্রথমে বাবা সোহানের দিকে এবং পর মুহূর্তে মা রুমানার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, আমার কিন্তু তাই মনে হয়।

স্নেহার কথা শেষ হতেই একমাত্র রুমানা ছাড়া সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

রুমানা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, হয়েছে হয়েছে খেতে বসে অতো হাসতে নেই। শেষে সরকে গেলে খাবার মাথায় উঠবে, কথা শেষ করে নিজেও হেসে উঠল।

এভাবেই স্বামী সন্তানদের নিয়ে চির দুঃখী রুমানার সাংসারিক জীবন যাপন সুখেই কাটছে। প্রতিদিন রাতের পর সকাল আসে আবার সকাল শেষে নেমে আসে রাত। প্রতিটা সকালকেই রুমানা নিজের জীবনের প্রথম সুন্দর সকাল মনে করে। আবার দিন শেষে চারদিক অন্ধকার করে যখন রাত নেমে আসে তখন নিজের অজান্তে ওর নারী মনে একটা অজানা ভয় এসে ভর করে। মাঝে মাঝে রাত জেগে ভাবে, এতো সুখ আল্লাহ ওর কপালে রেখেছে? স্বামী সন্তানদের বুকে জড়িয়ে ধরে বাকি জীবনটা পার করতে পারবে তো? সোহান কখনো ওকে ভুল বুঝবে না তো? মেয়েরা বড় হয়ে উঠছে। ওদের কাছে কখনো নিজের অতীত জীবন নিয়ে প্রশ্নের সম্মুক্ষিণ হতে হবে না তো নিজেকে?

ঘুমের মধ্যে চমকে উঠে রুমানা। ওর মনে হলো যেন ঘামদিয়ে জ্বর নামছে শরীর থেকে। সন্ধের পর আজ ভালো বৃষ্টি হয়েছে। বাইরের বাতাসও ঠাণ্ডা। তারপরও ঘামে ওর সমস্ত শরীর ভিজে গেছে। আঁচলে কপালের ঘাম মুছে পাশে শুয়ে থাকা স্বামী সোহানের দিকে তাকায়। কী নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে মানুষটা। মানুষটাকে দেখলে বুঝার উপায় নেই যে, এই মানুষটাই জীবনের শুরুতেই এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ওর মতো ঠিকানা বিহীন একটা ভাসমান

মেয়েকে সারা জীবনের জন্য নিজের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে। ওর মতো একজন উচ্চ শিক্ষিত উচ্চ বংশের এবং ধনি ঘরের ছেলে যে কিনা ইচ্ছা করলে এই সমাজের অনেক উঁচু সুপ্রতিষ্ঠিত ফ্যামিলির মেয়ে ঘরে আনতে পারত।

এই সব ভাবতে ভাবতে রুমানার ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। পাশে সোহান গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ডিম লাইটের মিষ্টি আলোয় সোহানের মুখটার দিকে আবার তাকায় রুমানা। ওর শান্ত শুভ্র মুখটা দেখে নিজেকে নিজে ধমক দেয়। এইসব কী যাতা ভাবছে ও। ও সোহানের সন্তানদের জন্মদাত্রী মা। আজ আর ওর নতুন কোনো পরিচয়ের দরকার নেই। আজ ওর একটাই পরিচয়, ও সোহানের স্ত্রী এবং সোহানের সন্তানদের জন্মদাত্রী মা। আজ এটাই ওর আসল পরিচয়। নিরাপদ স্থায়ী আশ্রয় স্থল। প্রতিটা নারীরই স্বামীর ঘরই হলো আসল আশ্রয় স্থল। নারী জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তার স্বামী। তারপরই তার সন্তান। এ দু'টোই আজ ওর জীবনে সত্য হয়ে বিরাজ করছে। ওতো বর্তমানকে নিয়েই ভাবতে চায়, থাকতে চায়। তবু কেন সেই দুঃখ মাখা অতীত এসে ওর সামনে দাঁড়ায়। শত চেষ্টা করেও সেই ফেলে আসা কষ্টমাখা অতীতকে ভুলতে পারে না। মা বাবা, ভাইয়েদের ঠিকানা জানার পরও আজ দীর্ঘ চৌদ্দ পনের বছর তাদের সাথে কোনো রকম যোগাযোগ করেনি। শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের কোনো খোঁজ খবর নেয়নি। নিতে গেলে যদি ওর অতীত নিয়ে আবার নাড়াচাড়া পড়ে যায়। যদি সেই অতীতের জন্য নিজের সন্তানদের কাছে প্রশ্নের সম্মুক্ষিণ হতে হয়।

সবকিছু জানার পরও এই সুখ শান্তি, স্বামী, সন্তান হারানোর ভয়ে এক বুক জ্বালা নিয়ে চুপ করে থাকে। সোহান মাঝে মধ্যে ওর মন খারাপ দেখলে জানতে চায় দেশের বাড়ির ঠিকানা স্বরণ করতে পেরেছে কি না বা কারো খোঁজ খবর জানতে পেরেছে কি না। স্বামীকেও বলতে পারছে না ওর এই কষ্টের কথা। ভীষণ ভয় হয় রুমানার। তবে কী সারা জীবন ওকে এই কষ্টের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যে রাত শেষ হয়ে ভোর হয় এবং কখন যে ক্লান্ত শ্রান্ত এই শরীরটা ঘুমের কোলে ঢোলে পড়ে জানতেই পারে না।

চৌধুরী গ্রুপ বাংলাদেশের ব্যবসায়ী মহলের কাছে পরিচিত নাম। ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে এদের বেশ কিছু শিল্প কারখানা আছে। এই গ্রুরুপেই নিজের কর্ম দক্ষতা সততা ও একাগ্রতার কারনে আনিসুল হক ধাপে ধাপে চৌধুরী গ্রুপের ম্যানেজার হতে পেরেছেন। তার কর্মদক্ষতার ও সততায় গ্রুপের চেয়ারম্যান আলী আহম্মেদ চৌধুরী মুগ্ধ। আনিসুল হক ছাড়া এক পা চলতে পারেন না। নিজেকে ঢাকার আদী বাসিন্দা বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করেন আনিসুল হক। নিজে শিক্ষিত শুধু তাই নন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যানেজম্যান্টে মাস্টার্স করা। অফিসিয়ালী বা আন অফিসিয়ালী সব জায়গাতেই আদি ঢাকার ভাষায় কথা বলেন। এতে কে কী ভাবল তার ধার তিনি ধারেন না। স্ত্রী ও দু'ছেলে সন্তান নিয়ে নিজের ছোট্ট সংসার। চাকরির বাইরে নিজে যেমন কারো সঙ্গে কোনো রকম ঝামেলা করেন না তেমনি কেউ তার সাথে করুক তাও চান না। যদি সে রকম কেউ করে থাকে তাহলে প্রথমে তাকে বলে বুঝিয়ে শুধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তারপরও যদি কেউ না বুঝে তার সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে ঝোলাতে চায় তাহলে তার আর নিস্তার রাখেন না। তার আগামাথা শেষ করে তবেই তিনি শান্ত হোন।

আজ অফিস থেকে কাজ শেষ করে বেরোতে বেরোতে আনিসুল হকের বেশ দেরি হয়ে গেল। দেরি হবে বলে ফোন করে বাসায় আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

আনিসুল হক সব সময় গাড়ির পিছনের সিটে বসেন। আজ অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়ির সামনের সিটে বসলেন।

আনিসুল হক সাহেব সাধারণত যখন খুব রিল্যাক্স মুডে থাকেন তখন বাইরে বেরোলে গাড়ির সামনের সিটে বসেন। এটা ড্রাইভার মবিন ভালো করেই জানে। তাই স্যার পাশের সিটে উঠে বসতে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, সিডিটা ছেড়ে দেই স্যার?

আনিসুল হক সাহেব এক কথায় শুধু বললেন, দাও। তারপর হাতের ঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে নিলেন। রাত নটা সতের। একটা বড় করে তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকে এলিয়ে দিলেন সিটের মধ্যে। ওদিকে গাড়ির

সিডিতে পংকজ উদাসের "ভালোবাসা ভালোবাসা এর আর কোনো নাম নেই" গানটা ঠাণ্ডা আমেজে বেজে চলেছে।

ইসতাম্বুল থেকে একটা মালের ওয়ার্ক অর্ডার আসার কথা ছিল। অর্ডারটা বড় হওয়ায় লাভের পরিমাণও বেশি। আর সেই কারণেই অফিস আওয়ারের পর এই রাত নটা পর্যন্ত চেয়ারম্যান ও মার্কেটিং অফিসারকে নিয়ে অডারের অপেক্ষা করছিলেন। অর্ডার সিরিভ করে সবাইকে বিদায় দিয়ে নিজেও বাসায় ফিরছেন।

গাড়িটা শাহবাগ মোড় ঘুরে পি.জি হাসপাতালের মানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ম্যাডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের পূর্ব পাশ দিয়ে যেই শেরাটন হোটেলের সামনে গেছে অমনি ট্রাফিক সিগন্যালে লাল বাতি জ্বলে উঠল। মবিন দ্রুত ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে সিগন্যাল উঠার অপেক্ষা করতে লাগল।

সিগন্যাল উঠে যেতে মবিন যেই গাড়ি টান দিল অমনি অনুভব করল কেউ যেন গাড়ির পিছনের দরজা খুলে সঙ্গে সঙ্গে আবার লাগিয়ে দিল। সিগন্যাল যেহেতু উঠে গেছে তাই আর গাড়ি রাস্তার মাঝখানে না থামিয়ে সিগন্যাল পার হয়ে রাস্তার একপাশে গাড়ি সাইড করে গাড়ির লুকিং গ্লাসে তাকিয়ে পিছনে কিছু দেখতে পেল না। পর মুহূর্তে শিউর হওয়ার জন্য মুখটা পিছন দিকে ঘুরিয়ে ভালো করে দেখল কাউকে দেখা যায় কী না।

না পিছনে কাউকে দেখা গেল না। মবিন মনে মনে নিজেকে নিজেই বলল, ধূর্ত এটা মনের ভুল। পাশে তাকিয়ে দেখল স্যার অঘোরে ঘুমাচ্ছে। আর দেরি না করে পুনরায় গাড়ি স্টাট দিয়ে স্যারের বাসার দিকে ছুটল।

ম্যানেজার আনিসুল হক সাহেবকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে মবিন প্রতিদিনকার মত গাড়ি নিয়ে গ্যারেজে রাখতে না গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

মবিনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আনিসুল হক বললেন, কি ব্যাপার মবিন কিছু কইবা?

দৃষ্টি মাটির দিকে রেখে একটা হাত দিয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, স্যার কিছু মনে না করলে একটা কথা বলতাম।

বল, মনে করার কী আছে।

না স্যার, মানে কাল তো বন্ধ। আপনার কি বাইরে কোনো কাজ আছে?

মবিনের মাথা চুলকানো দেখেই আনিসুল হক সাহেব আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। বললেন, কি তোমার ছুটি লাগব?

জি স্যার।

কয় দিনের?

আগামীকাল, একদিনের হলেই হবে।

আসল ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরে আনিসুল হক সাহেব বললেন, ছুটির লগে তোমার গাড়িও কি লাগব?

কাচুমাচু অবস্থায় মুখে কিছু না বলে মবিন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বোধক উত্তর দিল।

আনিসুল হক সাহেব যা বুঝার বুঝে নিলেন। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, গাড়ি নিয়া যাইতে চাও নিয়া যাও। তয় শর্ত হলো যেমন গাড়ি নিতাছ ঠিক তেমনই নিয়া আইবা। অন্যথায় কিছু হইলে তার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার। কেননা তুমি ভালা কইরা জান গাড়িটা আমি ব্যবহার করলেও প্রকৃত মালিক কিন্তু চৌধুরী গ্রুপ।

জি স্যার, এটা আমি জানি।

ও...কে তাইলে তুমি এহন নিয়া যাত পার।

এতটা সহজে অনুমতিটা পেয়ে যাবে মবিন ভাবতে পারেনি। খুশিতে ধন্যবাদ দেয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গেল। অন্যান্য দিনের মতো একটা সালাম দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিজের বাসার উদ্দেশ্যে। গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে আর ভাবছে, স্যার মানুষটা খুব ভালো। এক বারের জন্য জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলনা গাড়ি নিয়ে কোথায় যাব। কী করব। আবার নিজে নিজেই বলল, আল্লাহ তুমি স্যারের ভালো করো। তুমি তো জান... এমন সময় গাড়ির পিছনের সিটে কাওকে কেশে উঠতে শুনে চমকে উঠে গাড়ির ব্রেক কষে পিছন ফিরে আরো একবার চমকে উঠল।

একটা পনের ষোল বছরের মেয়ে পিছনের সিটে কাচুমাচু হয়ে অশ্রু সজল দৃষ্টিতে দু'হাত জোড় করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। দৃশ্যটা দেখে মবিন নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারছে না।

মবিনকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটা এবার কান্না মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, স্যার গাড়িটা রাস্তার মাঝখানে এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না। ওরা দেখে ফেললে আবার বিপদ হবে। তাছাড়া যেকোনো মুহূর্তে দুঃর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

মবিন কিছু বলতে যাচ্ছিল। মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ মেরে গেল। মুখটা সামনের দিকে ঘুরিয়ে গাড়ির স্প্রীড বাড়িয়ে দিয়ে দ্রুত স্থান

ত্যাগ করল। বাংলা মোটর ট্রাফিক সিগন্যাল পার হয়ে বামে মোড় নিয়ে সোজা বাসার পথে গাড়ি ছুটাল। পথে মেয়েটার সঙ্গে আর কোনো কথা বলল না। বাসার গেটে এসে হর্ণ বাজিয়ে গাড়ি বাড়ির সামনের রাস্তায় রেখে ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে এসে পিছনের দরজা খুলে দিয়ে মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, নেমে এসো।

মেয়েটা গায়ের উড়নাটা কোনো রকম টেনেটানে গায়ে মাথায় দিতে দিতে গাড়ির ভিতর থেকে নেমে আসল।

গাড়ির শব্দ পেয়ে এর ভিতর মবিনের মেয়ে মরিয়ম ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাবার সঙ্গে একটা অপরিচিত মেয়েকে দেখে কী মনে করে যেন কিছু না বলে মুহূর্তের মধ্যে আবার ঘরের ভিতর ঢুকে মা...মা...করে ডাকতে লাগল।

মবিনের স্ত্রী রাহেলা এশার নামাজ আদায় করে স্বামীর ফেরার ক্ষণ গুণছিল। মেয়ের ডাক শুনে বাস্তবে ফিরে মরিয়মকে উদ্দেশ্য করে বলল, কিরে মা মা করছিস কেন?

মরিয়ম মার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, জান মা, বাবা না অফিস থেকে কাকে যেন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

রাহেলা কৌতূহল দৃষ্টিতে বলল, কাকে নিয়ে এসেছে?

আমি চিনি না।

চল তো দেখি, কাকে নিয়ে এলো। কথা শেষ করে মরিয়মকে সঙ্গে নিয়ে গেটের দিকে পা বাড়াল।

ড্রয়িং রুমে এসে দৃশ্য দেখে রাহেলা হা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা সোফায় পনের ষোল বছরের একটা অপরিচিত মেয়ে চোখ ভরা জ্বল নিয়ে বসে আছে। আর অন্য একটা সোফায় স্বামী মবিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্তপর রাহেলা মবিনের দিকে তাকিয়ে কৌতূহল কণ্ঠে মেয়েটাকে দেখিয়ে বলল, কে?

আমি জানি না।

তুমি যান না মানে! ও এখানে কার সঙ্গে আসল?

আমার সঙ্গে।

তাহলে তুমি যে বলছ জান না?

হ্যাঁ, সত্যই তো বলছি। আমি জানলে না বলব ও কে।

তাহলে ও তোমার সঙ্গে এলো কিভাবে? আর তুমিই বা ওকে তোমার সঙ্গে আনলে কেন? কথাটা শেষ করে রাহেলা রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

মবিন দেখল রাহেলা ক্রমশ রেগে উঠছে। ওর রাগাটাই স্বাভাবিক। রাত দশটার সময় যদি কোনো বিবাহিত পুরুষ যে ঘরে স্ত্রী সন্তানরা থাকে সে ঘরে অপরিচিত অন্য একটা যুবতী মেয়েকে নিয়ে হুট করে ঢুকে পড়ে তাহলে তার নিজের স্ত্রী কেন সবার স্ত্রীরিই রাগা উচিত এবং প্রতিটা মেয়ে মানুষ সেটাই করে। রাহেলা আর দশটা মেয়েদেরই দলভুক্ত। সে কারনেই সেও ক্রমশ রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

তাই রাহেলাকে নিবৃত্ত করার জন্য বলল, তোমার সমস্যাটা আমি বুঝতে পারছি। এখন দয়া করে তুমিই ওকে জিজ্ঞেস কর, হঠাৎ রাস্তার মধ্যে এতো রাতে ও আমার গাড়িতেই বা উঠল কেন?

এতক্ষণ রাহেলা ঠোটে ঠোট চেপে চুপ করে স্বামীর কথা শুনছিল। মবিন কথা শেষ করতে রাগের সঙ্গে ঝড়ে পড়ল মেয়েটার উপর। চোখ লাল করে বলল, এই মেয়ে তুমি কে? কেনই বা এতো রাতে তারপর মবিনকে দেখিয়ে আবার ওর গাড়িতে উঠলে এবং এখানেই বা আসলে কেন?

এতক্ষণ মবিন ও এই মহিলার কথা শুনে মেয়েটা আর যাই বুঝুক না কেন এটা ঠিকই বুঝল যে, ওই মহিলা ওই লোকটার স্ত্রী। আর মহিলাটা এই বাড়ির কর্তী।

রাহেলা কথা শেষ করে কিছু বুঝে উঠার আগেই মেয়েটা মুহূর্তের মধ্যে সোফাথেকে উঠে এসে রাহেলার দু'পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, আপা আমাকে তাড়িয়ে দিবেন না। আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিলে আমার মরা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। ভাইজানের কোনো দোষ নাই। আমি খুবই বিপদ গ্রস্থ। বিপদে পড়েই নিজের মান ইজ্জত বাঁচানোর জন্য ভাইজানের অজান্তে তার গাড়িতে উঠেছি। কয়েক মুহূর্ত পর আবার বলল, আপনার ঘরে তো কাজের লোক লাগে। আমাকে তাই মনে করে একটু আশ্রয় দিন। আমি সারা দিন আপনার বাড়ির, আপনার সংসারের সমস্ত কাজ করে দেব। বিনিময়ে শুধু একটু নিরাপত্তা দিবেন। একটু আশ্রয় দিবেন। মেয়েটার শেষের কথাগুলো কান্নায় জড়িয়ে গেল। আর কোনো কথা বলতে পারল না। হেচকি তুলে দু'পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

হঠাৎ মেয়েটা এমন কাজ করবে এর জন্য রাহেলা মোটেই প্রস্তুত ছিল

না। মেয়েটার কান্না দেখে তার মনের ভিতর এতদিন ধরে লুকিয়ে থাকা এ সমাজের অসহায় মেয়েদের অসহায়ত্তের ছবি ভেসে উঠল। ভাবল, মেয়েটা হয়তো সত্যি সত্যি খুব বিপদে পড়েছে। দেখে শুনে তো মনে হচ্ছে খারাপ ঘরের মেয়ে না। মেয়েটা যখন আপা বলে ডাকছিল তখন রাহেলার মনে হচ্ছিল যেন, ওরই ছোট বোন ওকে আপা বলে ডাকছে। কেমন মায়া জড়ান সে ডাক। আল্লাহ দিলে এমন একটা বোন তারও তো থাকতে পারত।

নিজের অজান্তে দু'ফোটা অশ্রু গাল বেয়ে নেমে এল মর্তে। নিজেকে সামলে নিয়ে দু'হাত দিয়ে মেয়েটাকে তুলে দাঁড় করিয়ে চোখে চোখ রেখে বলল, কি নাম তোমার?

রুমানা।

বাসা কোথায়?

গ্রামে।

একটু চিন্তা করে নিয়ে রাহেলা আবার বলল, গ্রামে! তার মানে তুমি ঢাকায় থাক না?

জি না।

গ্রামে মানে, কোন জেলায়? কোন থানায়?

এখন কি বলবে। রুমানা মনে মনে ভাবতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, তা তো বলতে পারব না।

কেন? তোমার দেশের বাড়ির ঠিকানা তুমি জান না?

জানতাম কিন্তু এখন কিছু মনে করতে পারি না।

তাহলে ঢাকায় আসলে কিভাবে?

তাও আমার মনে নেই।

তার মানে!

রুমানা ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, জি আপা আমার কিছুই মনে নেই।

তাহলে মনে আছে কি?

শুধু এতটুকু মনে আছে, আমি এখানে যাদের কাছে ছিলাম তারা মানুষ না। মানুষ নামের পশু। রুমানা কথাটা বলে আবার কেঁদে ফেলল। আর কোনো কথা বলতে পারল না। কয়েক মুহূত সময় নিয়ে কান্না মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, আপা আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, পরে সবকিছু আপনাকে খুলে বলব। কথা শেষ করে আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

রাহেলা রুমানার মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিতে দিতে মবিনকে

দেখিয়ে বলল, তা না হয় শুনলাম। কিন্তু তুমি ওর গাড়িতে আসলে কিভাবে?

দু'হাতের তালুতে চোখ মুছে রুমানা বলল, আমি যাদের কাছে থাকতাম তারা গাড়িতে করে আমাকে বিক্রি করার জন্য কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা আমি ওদের আকার ইঙ্গিতে কথা বলতে শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই গাড়িতে বসে সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম। যেই জায়গায় সাহেবের গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল ঠিক তার উল্টো দিকের রাস্তার একপাশে আমি যে গাড়িটায় ছিলাম সেটার ড্রাইভার ও আমার সঙ্গের লোকটা চা খাবার জন্য পাশের ফুট পাতের চায়ের দোকানে গিয়েছিল। ব্যাস আমিও সুযোগের সৎব্যবহার করে ফেললাম।

এতক্ষণ পর মবিন মুখ খুলে জিজ্ঞেস করল, ওরা কি গাড়ির দরজা লক করে যায় নি?

গিয়েছিল। তবে আমি ভিতর দিয়ে কয়েকবার চেষ্টা করতেই দেখলাম দরজাটা খুলে গেল। গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে যেই সামনে এগোবো দেখি সামনে ট্রাফিক জ্যাম। পিছন ফিরে দেখি ওরা দু'জন ওদের গাড়ির দিকে আসছে তাই কিছু না ভেবেই সামনে যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল সেই গাড়িটায় চেপে বসলাম। এ ছাড়া আমার আর কোনো উপায়ও ছিল না। তারপর কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে মবিন ও রাহেলার উদ্দেশ্যে মিনতির সঙ্গে বলল, আপনারা দয়া করে আমাকে একটু আশ্রয় দিন। আমি বড় অসহায়, আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করবেন। কথা শেষ করে আবারও দু'চোখের পানি মুছল।

রাহেলা কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিয়ে স্বামী মবিনের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রুমানাকে বলল, ঠিক আছে মেয়ে। আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করে তোমাকে আপাতত আশ্রয় দিচ্ছি। তবে বেশি দিন আমরা তোমাকে ইচ্ছা থাকলেও রাখতে পারব না। তোমার ভাইয়ের সামান্য বেতনের টাকায় দুটো বাচ্চা ও ঢাকার বাসা ভাড়া এবং অবশিষ্ট যা থাকে তা দিয়ে আমাদের কোনো রকমে সংসার চলে। তবে তুমি চাইলে অন্য কোথাও তোমার থাকার জন্য আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি।

এমন সময় মবিন নড়েচড়ে উঠে রাহেলাকে উদ্দেশ্য করে বলল,

জান, স্যার না কয়েক দিন আগে ম্যাডামের কাজকামে সহযোগিতা করার জন্য একটা মেয়ে খুঁজে দিতে বলেছিল।

রাহেলা বলল, কোন স্যার?

আরে আমার স্যার, মানে আনিসুল হক স্যার।

রাহেলা নামটা শুনে মনে মনে আশ্বস্ত হলো। বলল, হ্যাঁ আনিস স্যার মানুষ হিসেবে খুব ভালো। তোমার মুখে ওনার স্ত্রীর কথাও অনেক শুনেছি। আমার বিশ্বাস রুমানা ওখানে এখানকার থেকে অনেক ভালো এবং নিরাপদ থাকবে।

কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিয়ে মবিনকে উদ্দেশ্য করে আবার বলল, তুমি বরং কালই স্যারের কাছে সব ঘটনা খুলে বলে দেখ, স্যার কী বলে।

রাহেলা কথা শেষ করতে মবিন রুমানার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার আপার কথা সব শুনলে তো? এবার বল, তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?

ওদের দু'জনের কথাগুলো শুনতে শুনতে রুমানার দু'চোখ ভরে অশ্রু গালবেয়ে নামছিল। এটা ওর বেদনার অশ্রু নয়। আনন্দ অশ্রু। মবিন কথা শেষ করতে দু'হাত দিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল, আপনাদের আমি বড় ভাই-বোন জেনেছি। আপনারা যা ভালো মনে করবেন তাতেই আমি রাজি খুশি।

পরদিন সকালে নাস্তা খেয়ে মবিন গাড়ি নিয়ে সোজা আনিসুল হক সাহেবের বাসায় গিয়ে হাজির হলো।

আনিসুল হক সাহেব বাড়ির ভিতরের বাগানে মর্নিং ওয়ার্ক করছিলেন। গাড়ি সমেত মবিনকে বাসায় ঢুকতে দেখে হাঁটা থামিয়ে আনিসুল হক গাড়ি বারান্দায় এগিয়ে এসে কৌতূহল কণ্ঠে বললেন, কী ব্যাপার মবিন, তুমি না গাড়ি সমেত আজ ছুটি নিলা, এই বিয়ান বেলাতেই তোমার কাজ শেষ হয়া গেল?

মবিন একটা হাত দিয়ে ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বলল, কাজে তো যেতেই পারিনি। শেষ করব কী করে।

কাজে যাইতে পার নাই মানে!

মবিন আনিসুল হকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, স্যার আপনি না কয়দিন আগে ম্যাডামের ফাল ফরমাশ শুনার জন্য একটা মেয়ে খুঁজে দিতে বলেছিলেন?

তা তো কইছিলাম।

স্যার মেয়ে একটা পেয়েছি। তবে...।

তবে আবার কি?

মেয়েটাকে পাওয়া নিয়ে একটা ঘটনা আছে।

হেইডা আবার কি?

স্যার গত কাল আপনাকে নামিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে হঠাৎ দেখি একটা মেয়ে গাড়ির পিছনের সিটে বসা। তারপর মবিন এক এক করে সব খুলে বলল এবং এও বলল যে তার পক্ষে মেয়েটাকে বেশিদিন লালন পালন করা সম্ভব না।

সব শুনে আনিসুল হক সাহেব কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, ঠিক আছে, তুমি বিকালে মাইয়াটারে লয়া আহ; ওর সঙ্গে বাতচিত কইরা দেহি যদি ভালা মনে হয় এবং ওয় যদি আমাগো এহানে থাকতে চায় তাইলে আমার আপত্তি নাইক্কা। তয় ফাইনাল কইতে পারুম কাইল। কারণ তোমার ম্যাডাম যদি আবার ওরে পছন্দ না করে তাইলে কিন্তু অন্য ব্যবস্থা ছাড়া উপায় থাকব না।

মবিন খুশি মনে বলল, ঠিক আছে স্যার। আমি তাহলে এখন যাই। বিকেলে মেয়েটাকে নিয়ে আসব।

মবিন চলে যেতে আনিসুল হক বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ একা একা ড্রয়িং রুমে বসে রইলেন। হঠাৎ কী মনে করে সুরাইয়া সুরাইয়া বলে ডাকতে ডাকতে পাক ঘরে গিয়ে হাজির হলেন।

ডাকতে ডাকতে স্বামীকে পাক ঘর পর্যন্ত আসতে দেখে কৌতূহল ভরা চোখে সুরাইয়া বেগম বললেন, কি এমন প্রয়োজন হলো যে আমার আসার অপেক্ষা না করে একেবারে নিজেই পাক ঘরে হাজির হলে?

সুরাইয়া বেগম কথা শেষ করতে দু'জনেই এক সঙ্গে হেসে ফেলল। হাসি থামিয়ে আনিসুল হক সাহেব বললেন, জান এতদিন পর তোমার লাইগা তোমার মনের মত একটা মাইয়া পাইছি।

বিস্ময় ভরা চোখে সুরাইয়া বেগন বললেন, আমার মনের মত মানে!

আরে বাবা তুমি খেপতাছ ক্যান? সবকিছু তোমারে খুইলা কইতাছি। হের আগে তুমি এক কাপ গরম চা লয়া আহ। আমি ঘরে যাইতাছি।

কিছুক্ষণ পর সুরাইয়া বেগম চা নিয়ে এসে কাপটা স্বামীর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, এই নাও তোমার চা।

আনিসুল হক সাহেব চা টা নিয়ে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে তৃপ্তির একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, হে দিন তুমি কইছিলা না সারাদিন একা একা বাসায় তোমার বোর লাগে। নিঃসঙ্গ লাগে। তাছাড়া সংসারের সব কাইজকর্ম করতে একা হাপাইয়া উঠ। তাই এর ভিতর একদিন আমার ড্রাইভার মবিনরে একটা মাইয়ার কথা কইছিলাম। কিছুক্ষণ আগে ওয় আইছিল। কইল একটা মাইয়া

পাওয়া গেছে।

সুরাইয়া বেগম উৎসাহ ভরা কণ্ঠে বললেন, কোথায় সেই মেয়ে? কথা শেষ করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন। বললেন, এটা তো ভালো সংবাদ কিন্তু তুমি মনে হচ্ছে হতাশা গ্রস্থ হয়ে আছ।

হ, তুমি ঠিকই ধরছ।

কারনটা জানতে পারি?

অবশ্যই জানতে পার। কারণ, সম্ভব অসম্ভব সব তোমার উপর নির্ভর করতাছে।

তোমার কথা বুঝতে পারলাম না। হেয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা খুলে বল তো।

আনিসুল হক সাহেব চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে বললেন, জান সুরাইয়া, মাইয়াটা খুবই অসহায়।

তুমি জানলে কিভাবে?

কিছুক্ষণ আগে মবিন আইছিল কইলাম না। ওই সব কইল।

আর কি কি বলল?

আনিসুল হক সাহেব এক এক করে মবিনের কাছে শোনা মেয়েটার সব কথা খুলে বললেন। কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে আবার বললেন, আমার মনে হয় কী জান, হয় মাইয়াটা যা কইতাছে তাই সত্য না হয় এমনও হইতে পারে যে, দুনিয়ায় অভাব অনটন এমন এক জিনিস যার কারনে মা বাবা তার অতি আদরের সন্তানটারে পর্যন্ত দূরে ঠেইলা দিতে কার্পণ্য করে নাই। কখনো বা নিজের অজান্তে সারা জীবনের জন্য বেইচা দেয়। অভাব যে কত মর্ম্মান্তিক যার কারনে মা বাবা পর্যন্ত নিষ্ঠুর থেকে আরো নিষ্ঠুর হইতে বাধ্য হয়। সে কারনেই হয়তো কোনো প্রলোভন কারীর প্রলোভনে পইড়া গ্রামের সহজ সরল মা বাবা অভাব থেকে মুক্তির লাইগা হ্যার হাতে সন্তানরে তুইলা দিছিল। হেই হারামজাদা মাইয়াটারে ঢাকায় আইনা নারী পাচার কারিগো কাছে বেইচতে নিয়া যাইতাছিল। মাইয়াটা বুঝতে পাইরা সুযোগ বুইঝা পলাইছে। এহন তুমি বুইঝা দেহ, মাইয়াটারে কী করবা।

স্বামীর মুখে সবশুনে সুরাইয়া বেগমের ভিতরে কন্যা সন্তানের জন্য লুকান সুপ্ত ভালোবাসাটা জেগে উঠল। ভাবল, আল্লাহর কাছে এত করে একটা মেয়ে সন্তান চাইলাম কিন্তু পেলাম না। আজ যদি এই মেয়েটার জায়গায় নিজের মেয়ে এমন বিপদে পড়ত। তাহলে...সুরাইয়া বেগম কথাটা আর ভাবতে পারলেন না। নড়েচড়ে বসে দরদ মেশান কণ্ঠে বললেন, ওগো

শোন, তুমি মবিনকে বল বিকেলেই মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে। আমি ওকে আমার কাছে রাখব।

সুরাইয়া বেগমের কণ্ঠে মাতৃ স্নেহের হাহাকার দেখে আনিসুল হক সাহেব খুশি হয়ে বললেন, ঠিক আছে তুমি এহন তোমার কামে যাও। আমি ফোন কইরা মবিনরে কয়া দিতাছি যেন কালকাই মাইয়াটারে লয়া আহে।

কালকে কেন? আজকে বন্ধ ছিল। আজিই তো আনতে পারে।

সবকিছু শোনার পরও স্ত্রীর আগ্রহ দেখে আনিসুল হক সাহেবের মনটায় ভালো লাগে। বললেন, ঠিক আছে আমি অহনিই মবিনরে কয়া দিতাছি যেন আজ বিকালেই মাইয়াটারে লয়া আহে।

বিকেলে আসার কথা থাকলেও মবিন রুমানাকে নিয়ে একটু আগেই এসে হাজির হলো আনিসুল হক সাহেবের বাসায়।

একবার কলিংবেল বাজতেই সদর দরজা খুলে দিল আনিসুল হক সাহেব নিজে। মবিনের সঙ্গে চৌদ্দ পনের বছরের একটা যুবতী মেয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে জড়োসড়ো হয়ে। এক নজর মেয়েটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে আনিসুল হক সাহেব মবিনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কি ব্যাপার মবিন, তোমার না সন্ধ্যায় আহনের কথা?

মবিন মুখে হাসি ফুটিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, আসতেই যখন হবে ভাবলাম একটু আগেই যাই, তাই চলে আসলাম।

ঠিক আছে ভালো করছ, আমি ও তোমার ম্যাডাম এই একটু আগে তোমাগো কথাই কইতাছিলাম। তারপর রুমানাকে দেখিয়ে আবার বললেন, এই কি হেই মাইয়া?

জি স্যার।

ঠিক আছে। ভিতরে আহো।

ভিতরে আসার পর ওদেরকে সোফায় বসতে বলে বললেন, তোমরা বস আমি ভিতর থাইকা আইতাছি।

কিছুক্ষণ পর আনিসুল হক স্ত্রী সুরাইয়া বেগমকে সঙ্গে নিয়ে ড্রয়িংরুমে ফিরে এসে দু'জনে পাশাপাশি সোফায় বসলেন। স্ত্রী সুরাইয়া বেগমকে উদ্দেশ্য করে রুমানাকে দেখিয়ে বললেন, এই সেই মাইয়া। কথা কয়া দেখ তোমার পছন্দ হয় কী না।

সুরাইয়া বেগম তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে মেয়েটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিলেন।

রুমানা জড়োসড়ো হয়ে সোফার এক কোনায় বসে আছে। মাঝে মাঝে সুরাইয়া বেগমের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

রুমানার অসহায় অবস্থা দেখে সুরাইয়া বেগমের মনে কন্যা সন্তানের জন্য মাতৃত্বের সুপ্ত ভালোবাসা আবারো চাঙা হয়ে উঠল। হাত তুলে মাতৃ স্নেহে রুমানাকে কাছে ডাকলেন।

রুমানা বাচ্চাদের মতো কেঁদে ফেলল।

সুরাইয়া বেগম উঠে দাঁড়িয়ে ধীর শান্ত পদক্ষেপে রুমানার কাছে এসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে মিষ্টি করে বললেন, আমি তোমার মোটামুটি সব কথা শুনেছি। এখন থেকে আর কাঁদবে না। পর মুহূর্তে আবার বললেন, তোমার নাম যেন কি?

কান্না জড়িত কণ্ঠে কোনো রকমে বলল, রুমানা।

এই তো ভালো মেয়ে। নামটা বলেছ বেশ সুন্দর।

তুমি কি আমাদের এখানে থাকবে?

এই অভাগীকে যদি আপনাদের পায়ে আশ্রয় দেন তাহলে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

ঠিক আছে, তোমার যে ক'দিন প্রয়োজন তুমি আমাদের এখানে আমাদের সাথে থাক। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তারপর পারমানেন্ট কাজের বুয়া সমিরণকে ডেকে বললেন, এই মেয়েটাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে গোসল করিয়ে আমার ঘরে নিয়ে আয়।

মবিন উঠে দাঁড়িয়ে আনিসুল হক সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলল, স্যার আমি তাহলে এখন আসি। তারপর রুমানার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার এখানে কোনো ভয় নেই। এখানে শুধু খাওয়া দাওয়া ও কাপড় চুপুড় পাবে তাই না এর সঙ্গে তুমি যেটা চাও সেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তাও পাবে। আর এটাই এ মুহূর্তে তোমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আর একটা কথা, সবসময় লক্ষ্য রাখবে যেন কোনো অবস্থাতেই স্যারের পরিবারের কেউ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়। কথা শেষ করে স্যারকে সালাম জানিয়ে যেতে উদ্দত হলো।

মবিনের কথাগুলো শুনে রুমানার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে পড়ল। হাতের তালুতে মুছে কোনো রকমে বলল, দোয়া করবেন আমি যেন আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারি।

সুরাইয়া বেগম বললেন, মবিন আর একটু বসো। কিছু না খেয়ে চলে যাবে?

ধন্যবাদ ম্যাডাম। আসলে আমার একটু তাড়া আছে। অন্য সময় খাব কথা শেষ করে সেদিনের মত মবিন বিদায় নিল।

সমিরণ বেগম সাহেবার কথা মত রুমানাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে শাবান, তোয়ালে এবং নিজের একটা পুরোনো শাড়ি দিয়ে গোসল খানায় ঢুকিয়ে দিয়ে ফিরে গেল নিজের কাজে।

কিছুক্ষণ পর সুরাইয়া বেগমের কানে গেল দরজায় কেউ যেন নক করছে। বললেন, কে?

বাইরে থেকে সমিরণ বলল, বেগম সাহেবা, আমি। ওরে নিয়া আসছি। ভিতরে আসুম?

তোকে আসতে হবে না। ওকে ভিতরে পাঠিয়ে দে।

কয়েক মুহূর্ত পর রুমানা দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল।

সুরাইয়া বেগম বিছানায় বসে দু'তিনটে শাড়ি দেখছেন। রুমানা ভিতরে আসতে শাড়িগুলো দেখিয়ে বললেন, তোমার বয়সী আমার কোনো মেয়ে আল্লাহ দেয়নি। আর আমিও শাড়ি ছাড়া সালোয়ার কামিজ পড়ে শান্তি পাই না। তাই শাড়ি ছাড়া তোমাকে পরার জন্য এমুহূর্তে অন্য কিছু দিতে পারছি না।

রুমানা শাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝল ওগুলো খুব দামি। বলল, যেটা পরে আছি সেটাই থাক না।

ঘরের মেয়ে যদি কাজের লোকের শাড়ি পরে থাকে তাহলে কি ভালো দেখা যায়?

রুমানা আর কোনো কথা বলতে পারল না, নিজের অজান্তে দু'গাল বেয়ে অশ্রু ধারা গালবেয়ে মর্তে নামতে লাগল।

সুরাইয়া বেগম কপট রাগের সঙ্গে বললেন, এই মেয়ে কাঁদছ কেন? নাও তাড়াতাড়ি নাও। এখান থেকে একটা শাড়ি নিয়ে পরে তাড়াতাড়ি ডাইনিং টেবিলে খেতে এসো। অনেক রাত হয়েছে। খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। সকালে নাস্তা খেয়ে ফ্রেশ মনে তোমার সব কথা শুনব। কথা শেষ করে নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সুরাইয়া বেগম শান্ত প্রকৃতির মহিলা। সাংসারিক জীবনে খুবই বুদ্ধিমতী ও ধার্মীক। স্বামী আনিসুল হক ও দু'ছেলে আমিনুল হক ও ফরিদুল হককে নিয়ে তার ছোট্ট সুখের সংসার। বড় ছেলে আমিনুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট ফাইন্যাল ইয়ারে। ছোট ফরিদুল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে

ইসলামের ইতিহাসে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। স্বামী আনিসুল হক চাকরির সুবাদে চৌধুরী গ্রুপের কাজ নিয়েই সর্বক্ষণ নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি তার এ উদাসিনতা নিয়েও কখনো অভিমানের স্বরে অভিযোগ করেন নি। সুরাইয়া বেগম নিজের তাগিদে নিজ থেকে দু'ছেলের লেখাপড়া সহ যাবতীয় দায় দায়িত্ব নিজ কাঁধে হাসি মুখে তুলে নিয়েছেন।

খাওয়ার টেবিলে সুরাইয়া বেগম দু'ছেলের সঙ্গে রুমানার পরিচয় করিয়ে দিয়ে ছেলেদের ও উপস্থিত অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে রুমানাকে দেখিয়ে বললেন, আমি আশা করি ও যতদিন এখানে আছে তোমরা সবাই ওকে আমাদের পরিবারের একজন সদস্য মনে করে নিবে এবং সেই মত ওর সঙ্গে আচার ব্যবহার করবে।

আমিনুল ও ফরিদুল দু'ভাই চোখ চাওয়াচায়ি করে রুমানাকে দেখতে লাগল। ফরিদুল পাশে বসা বড় ভাই আমিনুলের গায়ে চিমটি কেটে আস্তে আস্তে বলল, এই গেঁও ভূতকে মা-বাবা আবার কোথা থেকে ইনপোট করল? তার উপর মা যেভাবে ওকে সবাইকে গ্রহণ করতে বলছে আমার তো মনে হয় ওকে আমাদের পরিবারের আশ্রিতা হিসেবে নয় একেবার পারমানেন্ট সদস্য হিসেবে স্থান করে দেয়া হচ্ছে।

আমিনুল বল্লল, তাতে তোর কোনো সমস্যা হচ্ছে?

সমস্যা এখন পর্যন্ত হয়নি ঠিক, তবে ভবিষ্যতে হবে না তা তো তুমি বলতে পার না। তাছাড়া এর যে অবস্থা দেখছি, তাতে তো মনে হচ্ছে যদি ওকে পরিবারের সদস্য হিসেবে মেনে নিতেই হয় তাহলেও সত্যিকারভাবে ওকে আমাদের সোসাইটির উপযুক্ত করে তুলতে কমপক্ষে দু'চার বছর সময় লেগে যাবে।

ফরিদুলের কথা শুনে আমিনুলের বুঝতে আর বাকি রইল না যে, ও মেয়েটার উপর খেপে আছে। ওকে আর একটু খেপাবার জন্য আমিনুল বলল, তুই যাই বলিস না কেন, মেয়েটাকে দেখে কিন্তু আমার ভীষণ মায়া লাগছে। অভাব বা বিপদে না পড়লে কী কোনো মা বাবা এরকম একটা মেয়েকে ঢাকায় পাঠায়। তার উপর আবার অচেনা অজানা মানুষের বাসায় আশ্রিতা হিসেবে।

ও...বুঝতে পারছি, তুমিও মা বাবার দলে গিয়ে ভিড়েছ। কিছুটা অভিযোগের সুরে ফরিদুল কথাগুলো বলল।

এতক্ষণ দু'ছেলের কথা কেউ না শুনতে পেলেও সুরাইয়া বেগম ঠিকই শুনেছেন। ছেলেদের উদ্দেশ্যে বললেন, শুনো বাবারা। পৃথিবীর কথা বাদ দিই

আমরা যদি শুধু এই দেশের কথাই বলি তাহলে বলব, এদেশের কত মানুষ যে কত ভাবে জীবন ধারণ করে বেঁচে আছে আমাদের কাছে তার কোনো হিসেব নেই। আমরা তা রাখারও প্রয়োজন মনে করি না। আমাদের সমাজে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখ, আমরা যারা সমাজে নিজেদের ভদ্র ও শিক্ষিত বলে দাবি করি তাদের কাছ থেকে এদেশের হত দরিদ্র মানুষগুলো কিন্তু তা আশা করে না। এই ধর আমাদের কথাই, ওর মতো দু'চারটে মেয়ে বা ছেলের ভরণ পোষণ করার মত শক্তি সামর্থ কি আমাদের নেই? অবশ্যই আছে। কিন্তু আমরা তা করি না। আমরা আমাদের চারপাশের এ সমস্ত মানুষগুলোকে দেখেও না দেখার ভান করে এড়িয়ে যাই। ওকে আমি রাখব। শুধু তাই নয়, এই সমাজে সম্মান নিয়ে যাতে ও মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে সেই ব্যবস্থাও আমি করব। যাতে ওকে কেউ আংগুল তুলে কখনো কিছু বলতে না পারে। বাকি আল্লাহর ইচ্ছা। এখন তোমরা তোমাদের রুমে যেতে পার। আমি রুমানার সাথে কথা বলব।

দু'ছেলে খাওয়া শেষ করে যাওয়ার পরপর আনিসুল হক সাহেবও খাওয়া শেষ করে বেসিংয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিজের রুমে চলে গেলেন।

সুরাইয়া বেগম এবার রুমানার দিকে তাকিয়ে দেখলেন ও প্লেটে ভাত নিয়ে হাত দিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করছে। একটাও খাচ্ছে না। কপট রাগের সঙ্গে বললেন, কি ব্যাপার রুমানা তুমি খাচ্ছ না কেন?

তারপরও রুমানাকে ভাত না খেয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখে বললেন, প্লেট নিয়ে আমার পাশে এসে বোসো।

রুমানা বাধ্য মেয়ের মতো প্লেট নিয়ে সুরাইয়া বেগমের পাশের একটা চেয়ারে গিয়ে বসল।

সুরাইয়া বেগম ওর মাথায় একটা হাত দিয়ে মাতৃস্নেহ দিতে দিতে বললেন, বোকা ওদের কথায় মন খারাপ হয়েছে? আচ্ছা ওরা দু'জন যদি তোমার সত্যিকার মায়ের পেটের ভাই হত আর তখন যদি ওরা তোমাকে খেপাবার জন্য এমন কথা বলত তাহলে কি তুমি ওদের উপর রাগ করে থাকতে পারতে? মুখে হাসি ফুটিয়ে নিজে নিজেই আবার বললেন, পারতে না। কি তাই না?

সুরাইয়া বেগমের কথা ও কথার যুক্তি শুনে রুমানার সমস্ত কষ্ট, ব্যাথা, অভিমান নিমিষে ধুয়ে গেল। ফিক করে হেসে ফেলে মাথা নেড়ে সুরাইয়া বেগমের কথায় সায় জানাল।

সুরাইয়া বেগম আবার বললেন, এই তো মেয়ের ভয় কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ মনে রেখ, আমাদেরকে তোমার ভয় করে চলতে হবে না। তুমি শুধু একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখবে যাতে করে তোমার উপর আমাদের আস্থার ভীত শক্ত বই কী নরম না হয়। আর একটা কথা, কখনো কোনো অবস্থাতেই মিথ্যার আশ্রয় নেবে না। সব সময় মনে রাখবে, "একটা সত্য ঢাকতে দশটা মিথ্যা বলতে হয়।"

কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে আবার বললেন, কি মনে থাকবে তো যা যা বললাম?

জে আম্মা, মনে থাকবে।

রুমানার উত্তর শুনে সুরাইয়া বেগম মৃদু প্রতিবাদের স্বরে বললেন, কথাটা ওভাবে হবে না। আমি বলছি, খেয়াল দিয়ে শুন। "জি আম্মা মনে থাকবে।"

জি মনে থাকবে।

হেসে ফেলে সুরাইয়া বেগম বললেন, চিন্তা করার কিছু নেই। এক সময় সব কথা সুন্দর করে বলতে পারবে। সবে তো মাত্র এসেছ। এক সময় দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। আচ্ছা তোমাকে আমাকে আম্মা ডাকতে কে বলেছে?

কেউ না। আমার নিজের মন বলেছে।

রুমানার কথা শুনে সুরাইয়া বেগম তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, তুমি যদি আম্মা ডেকে শান্তি পাও ডেক। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

খাওয়ার শেষে সুরাইয়া বেগম সমিরণকে বললেন, রুমানা যে ঘরটায় থাকবে সেটা কি ঠিক করা হয়েছে?

জি আম্মা।

তাহলে যা ওকে ওর ঘরটায় পৌঁছে দেও । তারপর রুমানাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যাও মা ওর সঙ্গে যাও। অনেক রাত হয়েছে। সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড় তাহলে শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

রুমানা কোনো কথা না বলে নীরবে বাধ্য ছাত্রীর ন্যায় সমিরণকে অনুসরণ করে একটা ঘরের দরজার কাছে গিয়ে সমিরণকে দাঁড়িয়ে পড়তে

দেখে বলল, এ ঘরে আমি থাকব?

রাস্তার একটা মেয়ের প্রতি বেগম আম্মার ও সাহেবের এতো দরদ দেখে বিষয়টা সমিরণ ভালোভাবে মেনে নিতে পারে নি। ওর কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে, এর ভিতর কোনো কিন্তু আছে। ভিতরের কিন্তুটা জানার জন্য ওর ভিতরটা ছটফট করছে। কিন্তু বেগম আম্মার কথা মনে করে সাহস করতে পারল না। মনে মনে নিজে নিজেই অনুচ্চ স্বরে বলল, আজ থাক। এখানে আছে যখন তখন পরেও জানা যাবে।

আমাকে কিছু বললেন? রুমানা জিজ্ঞেস করল।

রুমানার কথায় বাস্তবে ফিরে এসে সমিরণ বলল, ও হ্যাঁ, আমারে কিছু কইলেন?

না মানে, আমি কি এ ঘরে থাকব?

জি বেগম আম্মা আমারে তাই বলছেন, ঘরে আপনার কোনো সমস্যা হইলে আমারে বলবেন। আমি আপনার সমস্যা পার কইরা দিমু।

ঠিক আছে বলে মুখে সৌজন্যের হাসি ফুটিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে রুমানা একেবারে অবাক হলো না। কেননা এর পূর্বে যেখানে ছিল সেখানকার ঘরটা এতটা পরিপাটি করে সাজানো গোছান না থাকলেও একে বারে ছিল না তাও না। সে যাই হোক। রুমানা ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিছানার পাশে ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে বসল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে নিজে নিজেই হাসল নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনে করে। পরক্ষণে নিজের ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগল, এরা মানুষ হিসেবে তো মনে হচ্ছে ভালোই। বাড়ির যে ক'জন সদস্যের সঙ্গে এ পর্যন্ত পরিচয় হয়েছে, তাদের ভিতর একমাত্র ছোট সাহেব অর্থাৎ ফরিদুল হক ছেলেটাই এ বাড়িতে ওর উপস্থিতিতে খুশি হতে পারেনি।

ফরিদুল হক সবার সামনে ডাইনিং টেবিলে তার মতামত জানানোয় ওর জন্য একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। তা না হলে এ বাড়িতে কে ওকে গ্রহণ করল আর কে গ্রহণ করল না তা বুঝতে অনেকটা সময় লেগে যেত। তাই ভাবল এখন শুধু ছোট সাহেবকে মানিয়ে নিতে পারলেই এখানকার এই নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা ওর জন্য অস্থায়ী হবে না। এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে ক্লান্ত দু'চোখে নিদ্রা নেমে এসেছে রুমানা বুঝতেই পারেনি।

নতুন আশ্রয়ে এসে রুমানার দিন ভালোই কেটে যাচ্ছে। এক এক করে এ বাড়ির সবার কাছেই রুমানা নিজেকে প্রিয় করে তুলতে পেরেছে। সবাই যেমন ওকে আপন করে নিয়েছে তেমনি ও নিজেও সবাইকে আপন করে নিয়েছে। আস্তে আস্তে নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া গত দু'বছরের ঘটনাগুলোকে নিজের স্মৃতির কবর খানায় কবর দিতে চেষ্টা করছে। তারপরও সেই স্মৃতিগুলো মাঝে মধ্যেই শিংওয়ালা গরুর মতো গুতো দিয়ে ওর মাঝে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেয়। তখন মন চায় পারলে দুনিয়াটাকে যারা নষ্ট করছে তাদের ধ্বংশ করে ফেলতে। যাতে করে আর কোনো রুমানার জীবনের স্বপ্নগুলো ওর মতো ধ্বংস হয়ে না যায়।

আর মা-বাবা, ভাইয়েদের কথা কোনো অবস্থাতেই মন থেকে মুছতে পারছে না। যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ শুধু মন চায় ছুটে যেতে চির চেনা চির জানা সবুজ গ্রামে। যেখানে ওর অসহায় মা-বাবা, ভাইয়েরা ওর আর একবার ফেরার অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকে গ্রামের মেঠ পথ পানে।

পরক্ষণেই চমকে উঠে ওর প্রথম ফেরার কথা মনে করে। ওই পিশাচটা ওর সঙ্গে প্রতারণা করেই শুধু ক্ষ্যান্ত হয় নি মোবাইলে ওর অসহায় দৃশ্য বন্দি করে বন্ধু বান্ধব সহ গ্রামের লোকদের দেখিয়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ার ওর শেষ আশ্রয় স্থলটাও বন্ধ করে দিয়েছে। ওর মা-বাবা, ছোট ভাইয়েদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওকে গ্রহণ করে নিজেদের কাছে আশ্রয় দিতে পারে নি। শেষে উপায়ন্ত না দেখে নিজের অসহায় জীবনের উপর বিত্রিশনায় আবার ফিরে এসেছিল সেই অন্ধকার জীবনে।

কিন্তু হায় জীবন! মানুষ এ দুনিয়ার এ ছোট্ট জীবনটার মায়া কেন যেন ভুলতে পারে না। শত কষ্ট প্রবঞ্চনার মাঝেও শেষ বারের মত আর একবার বাঁচার মত বাঁচতে চায়। রুমানাও হয় তো দ্বিতীয়বার সে রকম বাঁচার আশাতেই আবার ফিরে আসতে চেয়েছে। তাই তো সব প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে নিয়ে সামনে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছে। আনিসুল হক ও সুরাইয়া বেগমের মাঝে নিজের মা-বাবাকে এবং তাঁদের দু'সন্তানের মাঝে গ্রামে ফেলে আসা নিজের ভাইয়েদের খুঁজে নিয়েছে।

এ বাড়ির কাউকে এ পর্যন্ত নিজের মনের গহিনে লুকিয়ে রাখা কষ্টগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। ও এও চায় ভবিষ্যতেও যেন এর প্রয়োজন না হয়।

এর ভিতর একদিন সুরাইয়া বেগম রুমানার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দেখে ওকে জিজ্ঞেস করে পাড়ার হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি করে দিয়েছেন। দুর্ঘটনার বছর ও ক্লাস নাইনেই পড়ত। স্বাভাবিক জীবনে থাকলে আজ ও কলেজ জীবন শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য হয়তো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অধ্যায়নরত থাকত। হায় নিয়তি! হায় মানবতা! মানুষ জীবনে ভাবে এক হয় আর এক।

এত কিছুর পর আজ যখন সুযোগ আল্লাহ তালা দিয়েছেন তাই ভবিষ্যতের জন্য নিজের জীবনের সঙ্গে নিজেই আজ চ্যালেঞ্জ নিয়েছে। পড়াশোনা শেষ করে জীবনে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া দূর্ঘটনগুলোর এক এক করে প্রতিশোধ নেবে। আর ওর ভিতর এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, সে দিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন ওর শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজ হাতে প্রতিশোধ নিবে।

এর ভিতর সুরাইয়া বেগম ওর অতীত জীবন সম্বন্ধে জানার জন্য একদিন ধরেছিলেন। অনেক কষ্টে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল এই বলে যে, আম্মাজি আমার জীবনের অতীতটা সত্যিই খুবই দুঃখমাখা। সময় আসুক আমি নিজেই সেদিন বলব।

এ সংসারে মানে সুরাইয়া বেগমের সংসারে আশ্রিতা হয়ে আসার পর প্রথম প্রথম সমিরণের সঙ্গে সংসারের সমস্ত কাজে অংশ নিত ও। এতে সমিরণ খুশি হলেও সুরাইয়া বেগম খুশি হতে পারেন নি। যখনিই দেখেছেন তখনিই নিষেধ করেছেন। তারপরও রুমানা নিজের মত সংসারের কাজকর্ম করে যেত।

পড়াশোনার জন্য স্কুলে ভর্তি করে দেয়ার পর সুরাইয়া বেগম কড়া বিধি নিষেধ জারি করেছেন। এই বলে যে, সংসারের কাজকর্মে আর তুমি আসবে না। স্কুলে ভর্তি হয়েছ; এখন থেকে শুধু খাবার সময় খাবে। ঘুমাবার সময় ঘুমাবে আর বাকি সময় পড়বে। আর পড়বে। এর বাইরে তোমাকে যেন আর কিছুতে না দেখি।

এ কথার পরও রুমানা সংসারের কাজকর্ম থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে রাখতে পারেনি। বিশেষ করে প্রতিদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে আনিসুল

হক ও সুরাইয়া বেগমের হাত পায়ে রসুন তেল মালিশ করা। প্রতিদিন সকালে আনিসুল হক সাহেবের বেড টি করে নিজ হাতে পৌঁছে দেয়া। শীতের সময় আনিসুল হক সাহেবের গোসলের গরম পানি দেয়া। খাওয়ার সময় ডাইনিংয়ে নিজ হাতে সবাইকে পরিবেশন করে খাওয়ান। বিকেলে নাস্তার সঙ্গে গরম গরম চা সবাইকে দেয়া চাই। রাতের খাওয়ার পর আনিসুল হক ও সুরাইয়া বেগমকে নিজ হাতে দু'খিলি পান সেজে দেয়া। এই কাজগুলো শত নিষেধের মাঝেও ছাড়তে পারেনি রুমানা। বলে বলে কাজ হয় না বলে এখন আর সুরাইয়া বেগমও ওকে নিষেধ করেন না।

সুরাইয়া বেগমের সংসারে আশ্রয় পাওয়ার পর এভাবেই সুখের সান্নিধ্যে রুমানার জীবনের সময়ের চাকা গড়িয়ে চলতে লাগল।

সময় কারো জন্য বসে থাকে না। সে তার আপন গতিতে আপন কক্ষপথে সামনে এগিয়ে যায়। এভাবে দিন পেরিয়ে সপ্তা সপ্তা পেরিয়ে মাস মাস পেরিয়ে বছর গড়িয়ে আজ রুমানা স্কুল পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে। যদিও ওর জীবনের গাড়ির গতি দু'বছর পিছিয়ে পড়েছে তারপরও আজ প্রথম কলেজে ক্লাস করতে এসে মনে হচ্ছে যেন ও জীবনের নতুন আর এক অধ্যায়ে পা রাখল।

ওর প্রথম জীবন ছিল সবচেয়ে সুখের ও আনন্দের। যদিও ওর দরিদ্র দীন মজুর বাবা স্ত্রী ও তিন ছেলেমেয়েকে প্রতিদিন তিনবেলা পেট ভরে খেতে দিতে পারত না। তারপরও সংসারে যেন সুখের কোনো ঘাটতি ছিল না। তিন ভাই বোনের মধ্যে রুমানা ছিল সবার বড়। শত অভাবের মধ্যেও ওর দিন মজুর বাবা ওদের তিন ভাই বোনের পড়াশোনার প্রতি ছিল সজাগ। আর এ কারনেই ও বাড়িতে থাকা অবস্থায় নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পেরেছিল।

দ্বিতীয় জীবন থেকে ওর দুঃখের সময় শুরু। যদিও এ জীবনে পা দিয়েছিল আর একটু ভালো থাকার আশায়। আর একটু বেশি সুখ লাভের আশায়। প্রতিটা মানুষের মতো ওর জীবনেও এ সময় প্রেম নামে এক সোনার হরিণ স্বপ্ন দেখিয়ে ছিল। কিন্তু হায় ওর দেখা সেই সোনার হরিণ ছিল প্রতারণার চাদরে ঢাকা। বাইরে দিয়ে যার কোনো কিছুই ও বুঝতে পারেনি।

ওদের পাশের গ্রামের ছেলে হোসেন আলীর সঙ্গে স্কুলে যাওয়া আসার পথে ঘটনাক্রমে পরিচয় হয়েছিল। এক সময় সেই পরিচয় থেকে ভালোলাগা, ভালোলাগা থেকে ভালোবাসা। হোসেন আলীর সাথে যতবার দেখা হয়েছে ততবারই ওকে দেখেছে নতুন নতুন রূপে। এমন ভাবে ওর কাছে আসতো যে শুধু রুমানা কেন যে কেউ দেখলেই ভাববে বিশাল অবস্থাসম্পন্ন ঘরের শিক্ষিত ছেলে। যেমন দেখতে তেমন ছিল তার চলাফেরা।

আবার মাঝে মাঝে কিছু দিনের জন্য তাকে হঠাৎ দেখা যেত না। এ ব্যাপারে একদিন রুমানা হোসেন আলীকে জিজ্ঞেস করতে হেসে ফেলে বলেছিল, আরে বোকা মেয়ে লেখাপড়া শেষ করে এই গ্রামে পড়ে থাকলে কী জীবন চলবে? ভবিষ্যতের জন্য কিছু করতে হবে না? আর সে জন্যই আমাকে মাঝে মধ্যে ঢাকায় যেয়ে থাকতে হয়।

ঢাকায় আপনি কি করেন? কৌতূহল দৃষ্টিতে রুমানা জানতে চাইল।

ঢাকায় আমার এ্যাক্সপোর্ট-ইনপোর্টের ব্যবসা আছে।

তার মানে আপনি আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য করেন! গ্রামের একটা সহজ সরল মেয়ে যে রকম ভাবতে পারে রুমানাও ঠিক সে রকমটা ভেবে কথাটা বলল।

হ্যাঁ তাই।

বিদেশ থেকে আপনি কি কি জিনিস আমদানী-রপ্তানী করেন বলবেন?

কথাটা শুনে কিছুটা বিরক্তির সঙ্গেই হোসেন আলী বলেছিল, অনেক কিছুই করি। সময় হোক পরে একদিন তোমাকে বলব।

এরই ক'দিন বাদে একদিন স্কুল থেকে একেবারে কোচিং করে ফেরার পথে হঠাৎ বৃষ্টি নামল। রুমানা বৃষ্টির কারণে বৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা পুরোনো ভাঙা বাড়ির ভিতর গিয়ে আশ্রয় নিল।

এখন বুঝতে পারছে সেই দিনের সেই আশ্রয় নেয়াই আজ পর্যন্ত, না সারা জীবনের জন্যই ওর জীবনকে নিরাশ্রয় করে দিয়েছে।

পুরোনো ভাঙা বাড়িটায় গিয়ে আশ্রয় নেবার কয়েক মুহূর্ত পরই সেখানে হঠাৎ হোসেন আলী এসে হাজির হলো। রাস্তা থেকে পুরোনো ভাঙাবাড়িটা পর্যন্ত বৃষ্টির মধ্যে আসতে আসতে রুমানার শরীর বেশ ভিজে গিয়েছিল। আর এ কারণে ভিজে কাপড় ওর শরীরের সঙ্গে একেবারে লেপ্টে গিয়ে ওর বুকের জমিনে সদ্য গজিয়ে উঠা টিলা দুটো হিমালয় পর্বতের মতো উচু হয়ে

দিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছিল। ভাঙা বাড়িতে হোসেন আলীকেও এসে আশ্রয় নিতে দেখে প্রথমে রুমানা কিছুটা ভয় পেলেও পরক্ষণে এই নির্জন জায়গায় পাশে প্রেমিক পুরুষকে পেয়ে মনে মনে খুশিই হলো, এই ভেবে যে, নিজের নিরাপত্তা অন্তত ব্যাহত হবে না। তারপর নিজের দিকে তাকিয়ে ভেজা উড়নাটা টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে ভেসে উঠা হিমালয়ের চুড়া দুটোকে ঢাকায় ব্যার্থ চেষ্টা করল।

ভাঙা বাড়ির বারান্দায় উঠে রুমানাকে ভেজা কাকের মতো ভেজাকাপড়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্ময় ভরা চোখে হোসেন আলী বলল, কি ব্যাপার তুমি এখানে!

স্কুল থেকে কোচিং করে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি নেমে পড়ায় উপায় অন্ত না পেয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছি। কয়েক মুহূর্ত পর রুমানা পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনি এখানে আসলেন কিভাবে?

নিজের প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত মুখের পানি মুছতে মুছতে বলল, তোমাদের পাশের পাড়ায় এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম একটা কাজে। কাজ শেষে এ পথেই বাসায় ফিরছিলাম। পথে বৃষ্টি মশাই তোমার মতোই হঠাৎ করে এসে আমাকে তোমার সঙ্গে দেখা করাবার জন্য এখানে আনাল।

হোসেন আলী কথা শেষ করতে দু'জনেই হেসে ফেলল। এদিকে বাইরে আকাশে কালো মেঘের সঙ্গে তুমুল বৃষ্টির কারনে বিকেল বেলাতেই চারপাশ প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টির সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসের কারনে বৃষ্টির ঝাপটা এসে রুমানা ও হোসেন আলীকে আরো ভিজিয়ে দিতে লাগল। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডায় রুমানা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

রুমানাকে ঠাণ্ডায় কাঁপতে দেখে হোসেন আলী নিজের শরীর থেকে জামা খুলে এক প্রকার জোর করে রুমানাকে পরিয়ে দিতে দিতে বলল, তোমার যে অবস্থা দেখছি; আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে তো ঠাণ্ডা লেগে জ্বর আসবে।

হোসেন আলী যখন এক প্রকার জোর করে নিজের জামাটা রুমানাকে পরাচ্ছিল তখন প্রথম কয়েকবার বাধা দিলেও এক সময় রুমানা অনুভব করল হোসেন আলীর পুরুষালী হাতের স্পর্শে ওর শরীরের ভিতর একটা অজানা ভালোলাগা অনুভব হচ্ছে। ওর সমস্ত তনুমনুতে শিহরণ খেলে যাচ্ছে ওর শরীর যেন ওকে ছেড়ে হোসেন আলীর কাছে আত্মসমর্পন করতে চাচ্ছে। তাই এক সময় আর বাধা না দিয়ে বাধ্য মেয়ের মতো জামাটা পরে নিল।

জামাটা পরানোর পর দু'জনে বৃষ্টির ঝাপটা থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য একটা ভাঙা দেয়ালের আড়ালে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগল। এভাবে কিছুক্ষণ কাটানোর পর কথায় কথায় এক সময় হোসেন আলী রুমানার একটা হাত ধরে বলল, তোমার তো দেখছি এরই মধ্যে শরীর কাপিয়ে জ্বর আসছে। কথা শেষ করে রুমানা কিছু বুঝে উঠার আগেই ওকে নিজের উন্মুক্ত লোমশ বুকের মাঝে দু'বাহু দিয়ে চেপে ধরল।

হোসেন আলীর উত্তপ্ত ও লোমর্ষ বুকের মাঝে পৃষ্ট হয়ে প্রথম অবস্থায় বার কয়েক অলস প্রতিবাদ জানিয়ে এক সময় ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ল রুমানা। হোসেন আলীর ফাঁদে।

হোসেন আলী রুমানার দিক থেকে তীব্র প্রতিরোধ না পেয়ে আস্তে আস্তে রুমানার বুকে গজিয়ে উঠা ডালিম দু'টোর উপর হাতের হালকা স্পর্শ দিতে লাগল।

এদিকে জীবনে প্রথম কোনো পুরুষের আলীঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে রুমানার প্রথম দিকে কিছুটা ভয় ভয় লাগলেও কেন যেন সে রকম বাধা দিতে পারল না। আবার মনে হলো শরীরের ভিতর থেকে কে যেন ওকে পরাজিত করে নিজেকে হোসেন আলীর কাছে ধীরে ধীরে তুলে দিচ্ছে। সে ওর ভীতু মনকে এই বলে সাহস দিচ্ছে যে, ওতো অন্য কেউ নয় তোর প্রেমিক পুরুষ। তোর যা কিছু আছে সব তো ওর জন্যই। যেটা দু'দিন পর দিবি সেটা দু'দিন আগে দিলেই বা কী এমন ক্ষতি। ওর শরীরের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেল দেখবি, কত সুখ কত শান্তি এ দুনিয়ায় ও তোকে দেয়। এসব ভাবতে ভাবতে কখন যেন নিজের শরীরটা ওকে ছেড়ে দিয়ে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো জাপটে ধরে হোসেন আলীর কাছ থেকে নিজের হিস্যা আদায়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

রুমানার কাছ থেকে আস্তে আস্তে সাড়া পেতে দেখে হোসেন আলী ধীরে ধীরে রুমানার ঠোঁট দুটো নিজের মুখের ভিতর পুরে নিয়ে লজেন্সের মতো চুসতে লাগল। একটা হাত দিয়ে রুমানাকে নিজের কোলের উপর জাপটে ধরল অন্য হাতটা তখন দ্রুত গতিতে দৌড়ে বেড়াচ্ছে রুমানার শরীরের বিভিন্ন ভাঁজে। এভাবে কয়েক মুহূর্ত চলার পর রুমানাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে দেখে সুযোগ বুঝে নিজের শেষ ইচ্ছাটাও পূরণ করে নিল রুমানার কাছ থেকে। দুনিয়ায় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে কয়টা বেহেশতের সুধা দিয়ে রেখেছেন তার অন্যতমটা ছলনার মাধ্যমে, চাতুরির মাধ্যমে হোসেন আলী আদায় করে নিল রুমানার কাছ থেকে। উত্তেজনার বশে প্রথম অবস্থায়

রুমানার হুশ না থাকলেও কয়েক মুহূর্ত পর যখন উত্তেজনা কেটে গেল, তখন বুঝতে পারলেও ওখান থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনার মত কান্না ছাড়া অবশিষ্ট আর কিছু ছিল না ওর।

সে দিনই রুমানা সামান্য সময়ের সুখের বিনিময়ে সারা জীবনের জন্য কান্নাকে কিনে নিয়েছিল আর এর পর থেকেই ওর তৃতীয় জীবনের শুরু। প্রায় দিনই নানা উসিলায় হোসেন আলী রুমানার সঙ্গে দৈহিক মিলনে মত্ত হত। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুমানাকে বাধ্য হয়েই শেষে হোসেন আলীর সঙ্গে দৈহিক মিলনে যেতে হত। কিছু দিনের মধ্যে রুমানা নিজের শরীরের ভিতর অন্য কিছুর উপস্থিতি অনুভব করতে পারল।

একদিন হোসেন আলীর সঙ্গে মিলনের পর রুমানা হোসেন আলীকে বলল, আমাকে আপনার ঘরে কবে তুলবেন?

এই তো আর ক'টা দিন পরই। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হোসেন আলী বলল।

এই তো আর ক'টা দিন বলে বলে তো প্রায় তিন মাস হতে চলল। কথাটা রুমানা কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে বলল।

কেন? কি এমন হয়েছে যে তুমি এতো উতলা হয়ে উঠেছ? হোসেন আলী কৃত্তিম ভালোবাসা মেশানো কণ্ঠে বলল।

তুমি যত তাড়াতাড়ি পার আমাকে ঘরে তুলার ব্যবস্থা কর। আমার হাতে একদম সময় নেই।

স্মিত কণ্ঠে হোসেন আলী আবার বলল, সোনা ওভাবে বলছ কেন? তোমার সমস্যাটা কি?

তুমি বাবা হতে চলেছ।

তার মানে!

হোসেন আলীকে কথাটা শুনে আশ্চর্য হতে দেখে রুমানা চমকে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলল, তার মানে তোমার বাচ্চা আমার পেটে।

কথাটা শুনে হোসেন আলী নিজের ভিতর একটা ধাক্কা খেল। পর মুহূর্তে সামলে নিয়ে বলল, সোনা আমাকে আর কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে। হুট করে তো আর বিয়ে করে ফেলা যায় না।

কিন্তু আমি কি করব? মা বাবা, প্রতিবেশিরা তো আর আমাকে ছেড়ে দিবে না। তারা জানতে পারলে কি বলব?

কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিয়ে হোসেন আলী বলল, ঠিক আছে, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। দু'চার দিনের মধ্যেই আমি একটা ব্যবস্থা করছি।

এর ক'দিন বাদেই একদিন সন্ধায় হোসেন আলী রুমানাকে নিয়ে গ্রাম থেকে বিয়ের উদ্দেশ্যে ঢাকায় রওয়ানা হলো।

ভোর সকালে ট্রেন থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি ক্যাবে করে রুমানাকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা শহরের অভিজাত এলাকার একটা সুন্দর ছিমছাম দোতলা বাড়ির গেটে এসে হাজির হলো।

ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়িটার দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই একটা উঁচু লম্বা মোটা মোচওয়ালা লোক ওদের দু'জনকে ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, কি চাই?

হোসেন আলী বলল, ম্যাডাম হেলেন আছেন?

মোচওয়ালা লোকটা বড় বড় চোখ করে ধমকের স্বরে বলল, কেন? ম্যাডামকে কি দরকার?

ম্যাডামকে গিয়ে বলুন, হোসেন আলী এসেছে। কথাটা বিনয়ের সঙ্গে হোসেন আলী বলল।

মোচওয়ালা লোকটা গেটের পাশে একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকে ইন্টার কমে জানাতে অপর প্রান্ত থেকে একটা মেয়েলি কণ্ঠ বলল, ওর সঙ্গে আর কেউ আছে?

জি ম্যাডাম।

কে?

একটা মেয়ে।

ঠিক আছে, ওদের ভিতরে এনে ড্রয়িংরুমে বসাও।

অনুমতি পেয়ে মোচওয়ালা লোকটা গেট খুলে ওদের দু'জনকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসতে বলে নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

বাড়িতে ঢুকেই রুমানা অবাক। বাড়িটা বাইরে দিয়ে দেখতে যতটা না সুন্দর ভিতরে এসে দেখছে তার চেয়েও বেশি সুন্দর। সদর দরজা থেকে বাড়িটা বেশ দূরে। দরজা থেকে বাড়িটা পর্যন্ত পুরো রাস্তা পাকা। রাস্তার দু'ধারে নানা রকম ফুলের গাছ। প্রতিটা গাছ ফুলে ফুলে শোভিত হয়ে আছে যেন ওদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য। ড্রয়িংরুমে ঢুকে রুমানা আরো বেশি অবাক হয়ে গেল। বিশাল বড় একটা হল রুম। ঘরটার এক কোণে চাঁদ আকৃতির একটা উঁচু টেবিল। ওপারে ওষুধের দোকানের মতো সুন্দর একটা র‍্যাকে নানা রংয়ের নানা সাইজের বেশ কিছু কাচের বোতল সাজানো। রুমানা নিজে নিজেই ভাবল, হয় তো ওষুধের বোতলই হবে। নিজে নিজে

আবার ভাবল, কিন্তু ওষুধের বোতল তো এরকম হয় কখনো দেখিনি। মনের ভিতর একটা ধাক্কা খেল। আবার মনে মনে বলল, বোতলগুলো যারই হোক তা আমার জানার দরকার কি? তারপর ঘরের চারপাশে তাকাতে দেখল, ঘরের চারপাশের দেওয়ালে নানা ঢংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের বড় বড় ছবি টানানো। ঘরটার চারপাশে রাজকীয় বসার আসন সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা। আরো নাম না জানা অনেক কিছু নিয়ে পুরো ঘরটা সুন্দর করে সাজান গুছানো।

হোসেন আলী কেমন আছ?

মেয়েলি কণ্ঠে হঠাৎ কথাটা শুনে রুমানা বাস্তবে ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, একটা মধ্য বয়স্কা সুন্দর মহিলা মুখে হাসির রেশ টেনে একটা রাজকিয় আসনে গিয়ে বসল।

হোসেন আলী মহিলাটাকে দেখে বসা থেকে উঠে মুখ ভরা হাসি দেখিয়ে বলল, জি ম্যাডাম আপনাদের দোয়ায় ভালোই আছি।

মহিলাটা রুমানাকে দেখিয়ে বলল, এ কে? চিনলাম না তো?

মুখে হাসি রেখেই হোসেন আলী দু'হাত কচলাতে কচলাতে বলল, ও আমার স্ত্রী।

তুমি বিয়ে করলে কবে! বিস্ময় ভরা কণ্ঠে মহিলা বলল।

না মানে বিয়ে এখনো করতে পারিনি। তাই তো আপনার কাছে নিয়ে এলাম। হোসেন আলী একই ভঙ্গিতে বলল।

তার মানে! মহিলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বলল।

মানে ওরে আমি ভালোবাসি। তবে গ্রামের কিছু লোকজনের কারনে গার্জেনদের নিয়ে বিয়ের কাজটা বাড়িতে করা সম্ভব না। তাই ভাবলাম, আপনার কাছে নিয়া আসি। আপনি যেভাবে ভালো মনে করেন আমাদের বিয়ের ব্যবস্থাটা করে দিবেন।

মহিলা হোসেন আলীর কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিয়ে হোসেন আলীকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমার মা বাবা ব্যাপারটা জানে?

জি না, ম্যাডাম। হোসেন আলী বলল।

রুমানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটা আসন দেখিয়ে মহিলা বলল, এই মেয়ে বসো। তারপর আবার বলল, তোমার নাম কি?

রুমানা।

তারপর মহিলা হোসেন আলীকে উদ্দেশ্য করে রুমানাকে দেখিয়ে বলল, ওর মা বাবা জানে?

জি না।

তার মানে তোমরা পালিয়ে এসেছ? ঠিক আছে আমার কাছে যখন এসেছ তখন আর কোনো চিন্তা নাই। তুমি প্রস্তুতি নিয়ে এসো আমার এখানেই তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিব।

ঠিক আছে ম্যাডাম, ও তাহলে আপনার এখানে থাক। আমি সবকিছু ঠিকঠাক করে পরশুদিন আসছি। তারপর রুমানার কাছে গিয়ে সোহাগ মাখা কণ্ঠে হোসেন আলী বলল, তুমি ম্যাডামের কাছে থাক। ম্যাডাম খুব ভালো মানুষ। ম্যাডাম যেভাবে যা করতে বলে করো। আমি টাকা পয়সা জোগাড় যন্ত্র করে, একটা ঘরের ব্যবস্থা করে পরশুদিনের মধ্যে আসছি। তারপর বিয়ের কাজ শেষ করে আমরা আমাদের নিজের ঘরে গিয়ে উঠব। তুমি একদম মন খারাপ কর না।

এটাই ছিল রুমানার সঙ্গে হোসেন আলীর শেষ কথা। কথা শেষ করে সেদিন যে হোসেন আলী বিদায় নিল আজ অবধি তার আর দেখা মেলেনি।

হোসেন আলী বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর দিন থেকে রুমানার জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ের শুরু। পরদিন সকালেই হোসেন আলী যাকে ম্যাডাম নামে সম্বোধন করত সেই মহিলা রুমানার চেয়ে দু'তিন বছরের বড় একটা মেয়েকে সঙ্গে দিয়ে এক ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে পেটের বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দিল। প্রথমে রুমানা কিছু বুঝে উঠতে না পারলেও যখন বুঝল তখন ওর অবশিষ্ট সব শেষ।

গাড়িতে করে আসতে আসতে মেয়েটার কাছে সবশুনে রুমানা একেবারে থ মেরে গেল। কিছুতেই মেয়েটার কথা বিশ্বাস করতে পারল না। ওর মনে হলো যেন ও কোনো গোলক ধাঁধায় আটকে গেছে। যেভাবেই হোক গোলক ধাঁধা থেকে ওকে বের হতে হবে। কিন্তু বের হওয়ার রাস্তা ওর জানা নেই।

রুমানাকে চুপচাপ বসে ভাবতে দেখে মেয়েটা বলল, শোন মেয়ে, অতীত, ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন আর তোমার ভাবার কিছু নেই। তোমার অতীত বলে কিছু ছিল না আর ভবিষ্যৎ বলেও কিছু নেই। যা আছে সব বর্তমান। তোমার বর্তমান হলো, তুমি বিক্রি হয়ে গেছ; ম্যাডাম হোসেন আলীর কাছ থেকে তোমাকে নগদ পঁচিশ হাজার টাকায় কিনে নিয়েছে। তুমি এখন ম্যাডামের কেনা গোলাম। ম্যাডাম তোমাকে যখন যা করতে বলবে, যার সঙ্গে বিছানায় শুতে বলবে, যার সঙ্গে যেভাবে যা করতে বলবে, তোমাকে হাসি মুখে তা করতে হবে। এর অবাধ্য হওয়া তো দূরের কথা চিন্তাও করতে পারবে না। আর যদি করার চেষ্টা কর তাহলে কথাটা শেষ না করে নিজের

কামিজটা পিঠের দিকে তুলে ধরে বলল, এ দিকে তাকিয়ে দেখ। এর চেয়ে খারাপ বৈ কি ভালো কিছু তোমার কপালে জুটবে না। সবসময় মনে রাখবে, ম্যাডাম সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের সাথে ব্যবসা করে। ম্যাডামের কথামত কাজ করলে ম্যাডামের উন্নতির সাথে সাথে তোমার নিজেরও উন্নতি হবে। আর যদি তা না করে চালাকি করতে যাও, আর ম্যাডাম যদি তা জানতে পারে তাহলে জেনে রেখ; ম্যাডাম তোমার এমন অবস্থা করবে যে শেষে রাস্তার শেয়াল কুকুরে পর্যন্ত তোমাকে ছিড়ে খাবে। তোমার করার কিছুই থাকবে না।

সেই সেদিনের পর দীর্ঘ দুই বছর সেই নরক কুন্ডে কিভাবে যে কাটিয়েছে রুমানা নিজেও ভেবে পায় না। নরক কুন্ডের একেক দিনকে মনে হত একে বছর। একেক দিন ম্যাডাম নামের ওই মহিলা ওর ঘরে এমন বুনো শুয়োর ঢুকিয়ে দিত যেন ওরা পারলে ওকে ছিড়ে খেয়ে ফেল তো। মাঝে মাঝে মনে হতো পুরুষরা মেয়ে মানুষের শরীর পেলে কী মনে করে? যদি একবার পুরুষ হতে পারতাম, তাহলে একবার হলেও জীবনে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করতাম। একেক বার রাগে ঘৃণায় মনে হতো শা...লা বুনো শুয়োরের বাহাদুরির বীরত্বের জিনিসটা ব্লেড দিয়ে কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। তারপরও ম্যাডামের কথামত শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে কৃত্তিম উচ্ছসিত আনন্দ প্রকাশ করতে হতো। তাতেই বুনো শুয়োরের দল খুশিতে টগবগ হয়ে কখনো কখনো ওকে বিশেষ উপহার দিয়ে খুশি করার চেষ্টা করত। এভাবে এ দু'বছরের মধ্যে রুমানার যেমন বেশ কিছু টাকা জমেছিল তেমনি অনেকগুলো স্বর্ণের অলঙ্কারও হয়েছিল। মাঝে মধ্যে ম্যাডামের কথায় পার্টির বাসায় গিয়ে তার মনোরঞ্জন করতে হত।

ম্যাডাম পার্টির বাসায় পাঠানোর সময় পার্টির পাঠান অথবা নিজের গাড়িতে করে পাঠাত। গাড়িতে পাঠালেও কখনই একলা ছাড়ত না। সব সময় সঙ্গে একজন বডিগার্ড দিত। যাতে কাজ শেষ করে কোনো রকম চালাকির সুযোগ নিতে না পারে।

আল্লাহ চাইলে ঠেকায় কে। এমনি একদিন পার্টির বাসায় যাওয়ার পথেই আবার প্রায় এক বছর পর একদিন আল্লাহ ওকে সেই সুযোগ করে দিল। যার জন্য ও গত এক বছর প্রতিটা ক্ষণ, প্রতিটা মুহূর্ত নিরবে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করেছে আর সুযোগের অপেক্ষায় থেকেছে। আর এরপর থেকেই ওর জীবনের চতুর্থ অধ্যায়ের শুরু। ও জানে না, এটাই কী ওর এই কষ্টের জীবনের শেষ অধ্যায় না কী আর এক নতুন কষ্টের জীবনের অধ্যায়ের শুরু।

কলিংবেলটা দু'বার বেজে চুপ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর আবার বেজে উঠতে এক প্রকার বাধ্য হয়েই রুমানা দরজাটা খুলে অপরিচিত একজন সুদর্শন যুবককে দেখে চমকে উঠে বলল, কাকে চান?

সোহান আমিনুলদের বাসায় এই অপরিচিত মেয়েটাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। এতো সুন্দর কোনো মেয়ে হতে পারে? নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না। তিন চার বছর উচ্চ শিক্ষার খাতিরে আমেরিকায় কাটালাম। দেশীয় ছাড়াও বিদেশী অনেক মেয়ের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে, বন্ধুত্ব হয়েছে কিন্তু তাদের ভিতর থেকে একজনও ওর মনের দরজা খোলা তো দূরের কথা ঢোকার জন্য একটা টোকাও দিতে পারেনি। আজ এখন এই মুহূর্তে ওর সামনে যে মেয়েটা বিস্ময় ভরা মুখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সামনে দাঁড়িয়ে আছে এতো দেখছি প্রথম দর্শনেই ওর মনের দরজায় টোকা দেয়া তো দূরের কথা একেবারে ভেঙ্গে চুরমার করে মনের ঘরের পুরোটা দখল করে নিয়েছে। আর কিছুক্ষণ মেয়েটার সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো মুচ্ছা যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

দীর্ঘক্ষণ ধরে ছেলেটাকে কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়ে ওর দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতে দেখে রুমানা বিরক্তির সঙ্গে বলল, বোবা নাকি?

হ্যাঁ।

তার মানে! বিস্ময় ভরা চোখে রুমানা বলল।

না মানে, আগে ছিলাম না; এই একটু আগে হয়ে গেছি। সোহান ওর সামনের পাটির দাঁত বের করে হেসে বলল।

আপনি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কী মারছেন? বিরক্তির সঙ্গে রুমানা বলল।

প্রতিবাদের স্বরে সোহান বলল, মোটেই না। আপনিই বলুন, আপনার সামনেই যদি হঠাৎ করে কোনো ডানা কাটা পরি তার অতুলনীয় রূপ নিয়ে, টানা টানা হরিণীর চঞ্চল চোখ মেলে, দুরু দুরু বুকে এসে দাঁড়ায় তাতে কি আপনি ভিরমি খাবেন না?

অপরিচিত ছেলেটার কথা শুনে রুমানা চারপাশ একবার দেখে নিয়ে মনে

মনে বলল, বোবা না হলেও মনে হচ্ছে সত্যি সত্যিই ছেলেটার মাথায় কোনো সমস্যা আছে। দেখে শুনে তো মনে হচ্ছে ভদ্র ঘরের শিক্ষিত ছেলে কিন্তু এখানে এসেছে কেন? কার কাছেই বা এসেছে? নিজে নিজেই বিরক্তিরসঙ্গে বলল, যতসব উটকো ঝামেলা।

আমাকে কিছু বললেন? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সোহান বলল।

জি, জনাব। আপনাকে কিছু বলেছিলাম।

কি বলেছিলেন আর একবার শুনতে পারি?

এবার রুমানা স্বর একটু উঁচু করে বলল, আপনার আসল উদ্দেশ্যটা খুলে বলুন তো?

আপনি কি আমার উপর চটে যাচ্ছেন? সোহান পাল্টা প্রশ্ন করল।

আপনার কি মনে হয়?

কিরে রুমানা কার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কথা বলছিস? কথা শেষ করে ড্রয়িংরুমে এসে দাঁড়াতে আমিনুল দরজায় সোহানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ভরা চোখে বলল, দোস্ত তুই! কখন আসলি? দেশেই বা কবে আসলি?

মৃদু প্রতিবাদের সঙ্গে সোহান বলল, রাখ রাখ এক সঙ্গে এতোগুলো প্রশ্ন করলে কোনটার উত্তর আগে দিব। আমার মুখ তো একটাই। কথা শেষ করে দু'জনেই হেসে উঠল।

হাসি থামিয়ে সোহান আবার বলল, হ্যাঁ আমি তোর বন্ধু সোহান। দেশে ফিরেছি গতকাল। আর তোদের এখানে এসেছি, তা প্রায় আধ ঘন্টা হবে।

আধা ঘন্টা হয়েছে অথচ এখন পর্যন্ত বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিচলিত হয়ে উঠে আমিনুল বলল, তা তুই ভিতরে না ঢুকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

সোহান রুমানাকে দেখিয়ে হেসে ফেলে বলল, ওনি না হয় আমাকে চিনে না বলে ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেয়নি কিন্তু বন্ধু, তুমি তো চিনতে পারার পরও এখন পর্যন্ত ঢোকার অনুমতি দাওনি।

সোহান কথা শেষ করতেই দু'বন্ধুতে আবারও হো হো করে হেসে উঠল। আমিনুল হাসি থামিয়ে বলল, সরি দোস্ত, আয় ভিতরে আয়। আসলে অনেক দিন পর হঠাৎ তোকে দেখে কেমন যেন ভেবাচ্যাখা খেয়ে ফেলেছিলাম। তারপর সোফায় বসে রুমানাকে বলল, ভিতরে গিয়ে মাকে বলিস আমার বন্ধু সোহান এসেছে আর আমাদের দু'জনের জন্য নাস্তা পাঠিয়ে দিস।

রুমানা এতক্ষণ ওদের পাশে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। আর দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে নিজে নিজের কাছে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক বড় ভাইয়ের বন্ধু। অথচ তাকে এতক্ষণ ধরে দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে অপমান করেছি। ছিঃ ছিঃ ভদ্রলোক ওর সম্বন্ধে কী ভাবল? ভদ্রলোকের কাছে ওর অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত। তা না হলে ভদ্রলোক হয়তো ভাববে মেয়েটা সত্যিই অভদ্র। কিন্তু কীভাবে ক্ষমা চাইবে তাই ভেবে পাচ্ছে না। শেষে বাধ্য ছেলের মতো সংবাদটা দিতে এবং নাস্তার আয়োজন করে পাঠানোর জন্য ভিতরে চলে গেল।

রুমানা ভিতরে চলে যেতে সোহান বলল, দোস্ত মেয়েটা কে রে?

কোন মেয়েটা? আমিনুল বলল।

যাকে এইমাত্র নাস্তার কথা বললি।

ও...তুই রুমানার কথা বলছিস?

হ্যাঁ তাই। তারপর আবার বলল, আচ্ছা, আমার জানা মত তোর তো কোনো বোন ছিল না।

হ্যাঁ তা ঠিক। আমার এখনও কোনো বোন নেই।

তা হলে ও কে! বিস্ময় ভরা চোখে সোহান বলল।

কেন? ওর ব্যাপারে তোর এতো কৌতূহল কেন?

কারণ আছে। তুই আগে বল, মেয়েটা তোদের কি হয়?

আমিনুল মজা করার জন্য বলল, কেন, আমাদের কিছু হলে তুই কি ওকে বিয়ে করবি?

আমিনুল ওর কথার উত্তর না দিয়ে মজা করছে দেখে কপট রাগের সঙ্গে বলল, যদি বিয়ে করতে চাই তা হলে তোর কোনো আপত্তি আছে?

হ্যাঁ আছে?

কারণ?

কারনটা শুনার চেয়ে না শুনাই ভালো।

ঠিক আছে মানলাম তোর কথা। কিন্তু তুই তো আগে মেয়েটার পরিচয় বলবি।

তাহলে শোন, ও হলো আমাদের বাসায় আশ্রিতা। নাম রুমানা। তবে আশ্রিতা হলেও ওকে আমরা কখনো বোন ছাড়া অন্য কিছু ভাবি না। তারপর সংক্ষেপে ওর জানা মত রুমানার অতীত ইতিহাস বর্ণনা করে বলল, মা ওকে নিজের মেয়ের মতো জানে। পড়াশোনা জানে জানার পর স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। এস. এস. সি ভালো ভাবেই পাশ করেছে। এবার ইন্টার দিবে।

আমিনুলের মুখে সব শুনে সোহানের মনের ভিতর ঝড় বইতে শুরু

করল। ঝড়ের গতি এতটাই প্রচণ্ড যে, সব কিছু তছনছ করে ফেলতে মন চাচ্ছে। মনে মনে বলল, শা...লা জীবনে এই প্রথম একটা মেয়েকে মনের ঘরে ঢুকতে দিলাম আর এটাতেই মন হোঁচট খেল। আবার ভাবল, আমিনুল কি ওর সঙ্গে মজা করছে? নাকি যা বলল সবিই সত্যি? আর কিছু ভাবতে ভালো লাগছে না সোহানের।

এমন সময় রুমানা চা নাস্তা নিয়ে এসে টেবিলে পরিবেশন করে লজ্জা মিশ্রিত কণ্ঠে খাওয়ার কথা বলে যেই দৃষ্টি তুলল সোহানের দিকে অমনি দেখল, ছেলেটাও ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চার চোখের মিলন হতে সঙ্গে সঙ্গে রুমানা লজ্জায় রক্ত জবার মতো লাল হয়ে উঠল। এমনিতে রুমানার গায়ের রং গোলাপি। লজ্জা পেয়ে যেন সেই রং সিঁদুরের মতো টুকটুকে লাল হয়ে উঠল। রুমানা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে গেল।

রুমানা চলে যেতে সোহান বলল, হ্যাঁ তুই যেন কি বলছিলি?

কোন বিষয়ে? বিস্ময় ভরা চোখে আমিনুল বলল।

ওই যে রুমানার ব্যাপারে।

ওর কথা একটু আগে যা বললাম, যতটুকু বললাম, আমি তার চেয়ে বেশি আর কিছুই জানি না। এবার বল, তুই কেমন আছিস?

ভালো। সোহান ছোট্ট করে বলল। তারপর আবার বলল, তুই কেমন আছিস বল?

আমিও এক রকম আছি আর কী। পড়াশোনা শেষ করে একটা ভালো চাকরির চেষ্টা করছি। আমার কথা বাদ দে। এখন বল, পড়াশোনা শেষ করে এসেছিস তো? নাকী আবার যাবি?

বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ শেষ করে এসেছি।

তাহলে এবার বিয়েশাদি করে বাবার ব্যাবসায় বসে পড়। নাকি অন্য কিছু মাথায় নিয়ে বসে আছিস?

না অতসব এখনো চিন্তা করিনি। সবে তো এলাম। কটা দিন যাক তারপর ভেবে চিন্তে একটা সিদ্ধান্ত নিব। কথা শেষ করে বলল, তাহলে দোস্ত আজ আসি। অনেকদিন পর দেশে ফিরলাম। জানি তুই ব্যস্ত তারপরও মাঝে মধ্যে ডাকলে একটু সময় দিস। খুশি হব।

তুই আমার কাছে সময় চাইবি আমি দিব না এটা তুই ভাবতে পারলি! অভিযোগের স্বরে আমিনুল বলল।

শুনে খুশি হলাম। ঠিক আছে আজ তাহলে আসি তারপর উভয় উভয়কে আল্লাহ হাফেজ বলে বিদায় জানাল।

আমিনুল ও সোহান উভয়েই খুব ঘনিষ্ট বন্ধু। শুধু বন্ধুই নয় ওরা দু'জন সেই ক্লাস সিক্স থেকে কলেজ জীবন পর্যন্ত একই সঙ্গে একই স্কুলে, কলেজে যেমন পড়েছে তেমনি প্রাইভেট পর্যন্ত একই স্যারের কাছে পড়েছে। এছাড়াও ওদের দু'জনের বন্ধুত্ব গাঢ় হওয়ার আর একটা অন্যতম কারণ হলো, সোহান আমিনুলের বাবার বসের ছেলে। বসের ছেলে হলেও ওদের বন্ধুত্বের মাঝে ওদের বাবারা যেমন কখনো বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি তেমনি ওরাও কখনো ওদের সামনে বাবার পরিচয় নিয়ে আসেনি।

সেই দিন আমিনুলদের বাসায় রুমানাকে দেখে আসার পর থেকে সোহানের মনে আর শান্তি নেই। এক মুহূর্তের জন্য মনের ভিতর থেকে রুমানাকে সরাতে পারছে না। দু'চোখের পাতা এক করলেই রুমানার মায়ামাখা সুন্দর মুখ খানা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ভাবে, এরকম একটা সুন্দর মেয়ের জীবনে এরকম একটা দুর্ঘটনা ওর জীবনকে তছনছ করে দিল। আবার ভাবে, জীবনের প্রারম্ভে ওর জীবনে কী এমন ঘটেছিল যে, ওকে মা-বাবা, ভাইবোন, সমাজ-সংসার ছাড়তে হয়েছিল? বিষয়টা জানার জন্য ওর মনের ভিতর সোহান একটা তাগাদা অনুভব করল।

কী মনে করে মোবাইলটা হাতে নিয়ে আমিনুলের বাসার ল্যান্ড ফোনে কল করল।

ফোনটা কয়েক বার বেজে উঠতে ওপাশ থেকে একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেসে আসল, হ্যালো আসসালামুয়ালাইকুম। কে বলছেন প্লিজ?

সালামের উত্তর দিয়ে সোহান বলল, কে, রুমানা?

জি হ্যাঁ, কাকে চাচ্ছেন? পর মুহূর্তে আবার বলল, আপনি কে বলছেন?

আমি সোহানুর রহমান চৌধুরী।

কয়েক মুহূর্ত পর রুমানা বলল, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না। কাকে চাচ্ছেন প্লিজ?

আমি যাকে চাচ্ছি তার সঙ্গেই কথা বলছি।

আপনি কি বলতে চাচ্ছেন? রুমানার কণ্ঠে উত্তেজনা প্রকাশ পেল।

সোহান ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আর একটু রাগাবার জন্য বলল, আমি তো আপনার সঙ্গে মিথ্যে বলিনি। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যই ফোন করেছি।

একই ভঙ্গিতে রুমানা আবার বলল, আমি অপরিচিত কারো সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলি না। তাছাড়া আপনি এ নম্বর পেলেন কোথা থেকে? আর আমার নামিই বা জানলেন কি করে?

সোহান হেসে ফেলে বলল, এই তো এতোক্ষণে আপনি বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছেন। আর একটু আগে বললেন কী আমার সাথে কথাই বলবেন না। আমার সঙ্গে কথা না বললে আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনার আর জানাও হবে না। তারপর আবার বলল, কি ঠিক বলিনি?

আমি মানছি আপনি বেশ বুদ্ধিমান। কিন্তু আপনি যদি ভেবে থাকেন আপনার কথার প্যাঁচে পড়ে আমি আপনার সঙ্গে পরিচয় না জেনেই কথা বলে যাবো তাহলে ভুল ভেবেছেন। কথা শেষ করে সোহানকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়ে রুমানা রিসিভারটা ক্রাডেলে রেখে দিল।

রুমানার কান্ড দেখে সোহান প্রথমে হতবাক হয়ে গেল। পর মুহূর্তে হেসে ফেলে আবার ডায়াল করল।

কয়েকবার রিং হওয়ার পর ওপাশ থেকে রুমানা আবার রিসিভ করে বলল, কে বলছেন প্লিজ?

আমিও মানছি আপনি বেশ বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণ। তবে এবার আমার কথা না শুনে দয়া করে ফোনটা রেখে দিবেন না।

আমি তো আপনাকে বলেছি, আমি অপরিচিত কারো সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলি না। আপনার যদি এ বাড়ির অন্য কারো সঙ্গে প্রয়োজন থাকে বলুন, আমি তাকে ফোনটা ধরিয়ে দিচ্ছি।

দেখুন আপনি অযথাই আমার উপর চটছেন। আমি কিন্তু প্রথমেই আমার পরিচয় দিয়েছি।

কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না।

আমি বিশ্বাস করছি আপনার কথা। সেই সঙ্গে অনুরোধ করব, একটু চেষ্টা করুন তাহলেই চিনতে পারবেন।

দেখুন আপনি অযথাই কথা বাড়াচ্ছেন। আমি এবার ফোনটা রাখব। রুমানার কণ্ঠে একই সুর।

শুনুন শুনুন প্লিজ, ফোনটা রাখবেন না। ঠিক আছে, আমিই আপনাকে

আমাকে চিনিয়ে দিচ্ছি। আমি হলাম গিয়ে আপনি যে বাড়িতে আছেন সে বাড়ির বড় ছেলে আমিনুলের বন্ধু সোহান। কয়েক মুহূর্ত পর আবার বলল, এখনো চিনতে পারেন নি? ঠিক আছে, তাহলে আরো খোলাসা করে বলছি, গত তিনদিন আগে আপনাদের বাসায় আপনার সঙ্গে যে ছেলেটার আজকের মত দীর্ঘক্ষণ ঝগড়া হয়েছিল; আমি সেই ব্যক্তি। নাম আমার সোহানুর রহমান চৌধুরী।

সোহানের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুমানার কানে যেন তালা লেগে গেল। ওর মনে হলো, ও যেন চিরদিনের জন্য বধির হয়ে গেছে। ছিঃ ছিঃ বড় ভাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে আজ নিয়ে দু'দুদিন এ কী করলাম। ভদ্রলোক ওকে কী ভাবল? এখনো সেদিনের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়নি তার আগেই আজ আবার একই ভুল করলাম। হাই হাই আজকের ঘটনাও যদি বড় ভাই জানতে পারে তাহলে কি ভাববে? ভদ্রলোকের সঙ্গে এভাবে কথা বলা একদম ঠিক হয়নি। ভদ্রলোক যদি অপমান বোধ করে? এভাবে রুমানা মুখে কিছু না বলে মনে মনে নানা কথা ভেবে ভেবে লজ্জায় ওর মাথা কাটা যাওয়ার অবস্থা হলো।

অনেকক্ষণ রুমানাকে কথা বলতে না দেখে সোহান আবার বলল, কি ব্যাপার কথা বলছেন না যে? এখনো কি চিনতে পারেন নি?

কথা বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে রুমানা লজ্জা মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, দেখুন আপনি বিশ্বাস করুন আমি আপনাকে আজও চিনতে পারিনি। সেদিনকার জন্য এবং আজকের আমার দুর্ব্যবহারের জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি দয়া করে মনে কিছু করবেন না।

হেসে ফেলে সোহান বলল, না না, এখানে মাফ চাওয়ার কি আছে? আপনার জায়গায় আমি হলেও তাই করতাম।

না তারপরও আমি আমার ব্যবহারের জন্য লজ্জিত। কারণ আপনি বড় ভাইয়ার বন্ধু। আমার উচিত ছিল, আপনার কথাগুলো ভালো করে শোনা এবং বোঝা।

আবারও হেসে ফেলে সোহান বলল, ঠিক আছে ঠিক আছে। আপনি বিচলিত হবেন না। আমি আসলে আপনার কথায় কিছু মনে করিনি। আমারই বরং উচিত ছিল, আপনার কাছে প্রথমেই আমার পুরো পরিচয় দেয়া।

রুমানা আশ্বস্ত হয়ে বলল, শুনে খুশি হলাম।। তারপর আবার বলল, আপনার কি বড় ভাইয়াকে দরকার আছে?

না। আসলে সত্য বলতে কী আজ আমি ফোন করেছি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যই। আমার সঙ্গে কথা বলতে কি আপনার আপত্তি আছে?

কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিয়ে রুমানা বলল, কি ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন জানতে পারি?

অবশ্যই তা জানতে পারেন।

শীতল কণ্ঠে রুমানা বলল, বলুন কি ব্যাপারে কথা বলতে চান?

দেখুন, আমি ও আমিনুল স্কুল জীবন থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি। আমরা দু'জন শুধু বন্ধুই নই তার চেয়েও বেশি কিছু। আমি উচ্চ শিক্ষার জন্য গত চার বছর বিদেশে ছিলাম। পড়াশোনা শেষ করে এই ক'দিন হলো দেশে ফিরেছি।

কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে কি ব্যাপারে কথা বলতে চান, তা কিন্তু এখন পর্যন্ত বলেন নি?

হ্যাঁ বলছি। আর সেটা হলো, আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। দয়া করে আমাকে ফিরিয়ে দিবেন না।

সোহানের কথা শুনে রুমানার মনে হলো যেন ও দুনিয়ায় নেই। ভদ্রলোক কি বুঝাতে চাচ্ছে? মুহূর্তের ভিতর হোসেন আলীর কুৎসিত প্রতিচ্ছবিটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর সমস্ত শরীরে। ওর শীরা উপ শিরাগুলো শক্ত হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে। রক্তের সঞ্চালন গতি যেন কয়েকশ গুণ বেড়ে গেল। বহু তিতিক্ষার পর পরম দয়ালু ওকে এই আশ্রয়টুকু পাইয়ে দিয়েছেন। শত প্রলোভনেও এই আশ্রয় নষ্ট করা যাবে না। এই বাড়ির ভালো মানুষগুলোর আশ্রয়ে থেকেই ওকে দুনিয়ার জীবনে বাঁচার জন্য মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। যতদিন ও দুনিয়ার বুকে মেয়ে মানুষ হয়ে থাকবে ততদিন ওর পিছনে বিপদ তাড়া করে ফিরবে।

রুমানাকে অনেকক্ষণ কথা না বলে চুপ করে রিসিভার ধরে থাকতে দেখে সোহান আবার বলল, কি, কথা বলছেন না যে?

দেখুন, আপনি বড় ভাইয়ার বাল্য বন্ধু। আমি আশা করব, ভবিষ্যতে আপনি আপনার সম্মান বজায় রেখে চলবেন। ভবিষ্যতে আর কখনো আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবেন না। ঝাঝাল কণ্ঠে এক টানে কথাগুলো বলে রুমানা ঠাস করে ফোনটা রেখে দিল।

চৌধুরী গ্রুপের চেয়ারম্যান আলী আহম্মেদ চৌধুরী ও ইয়াসমিন ইলেন চৌধুরীর একমাত্র সন্তান সোহানুর রহমান চৌধুরী সোহান।

একমাত্র ছেলে সোহান দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে এসেছে। এখন ইলেন বেগমের বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তাদের সমাজের একটা টুকটুকে মেয়েকে একমাত্র ছেলের জন্য বউ করে আনা। তারপর ছেলের হাতে ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝিয়ে দিয়ে নাতি নাতকুড়িদের নিয়ে বাকি জীবনটা সুখে শান্তিতে কাটিয়ে দেয়া।

তাই আজ রাতে খাওয়ার পরে শুতে এসে ইলেন বেগম ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আয়নায় তাকাতে দেখল স্বামী আলী আহম্মেদ চৌধুরী পিছনে বালিশ দিয়ে খাটে হেলান দিয়ে বসে এক মনে একটা বই পড়ছে। ইলেন বেগম চুলে বেনি করতে করতে বললেন, তুমি শুনছ?

বইয়ের ভিতর দৃষ্টি রেখেই আলী আহম্মেদ সাহেব বললেন, বল শুনছি।

বলছিলাম কি, ছেলে তো পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরেছে। এক্ষুণিই যদি একটা ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে দেয়া যায় তাহলে আর হুট করে আবার বিদেশে যেতে চাইবে না।

কেন, ওকি বলেছে; ও আবার বিদেশ যাবে?

বলেনি তো কি হয়েছে? যদি বলে তখন বাঁধা দিয়ে রাখতে পারবে? ছেলে আমাদের রাজপুত্র। বলতে পার আমাদের কপাল ভালো যে, দেশে আসার সময় সঙ্গে কোনো ধবল মেয়েকে নিয়ে এসে বলেনি, এই তোমাদের বউ।

বলেনি যখন তখন অযথা চিন্তা করছ কেন?

যদি সত্যি সত্যি নিয়ে এসে বলত তাহলে কি তুমি খুশি হতে?

এখানে খুশি অখুশির কথা আসছে কেন?

দেখ তোমার মতো আমি আমার মাথায় সারাক্ষণ ব্যবসার লাভ লোকসানের চিন্তা ঢুকিয়ে রাখি না। আমি মা। আমি চাই আমার সন্তান বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে। একটা ভালো, সুন্দর, টুকটুকে বউ এনে দিব। বউ নিয়ে আমাদের সঙ্গে সুখে শান্তিতে থাকবে। ব্যাস, এতেই আমি খুশি।

তোমার কথাশুনে মনে হচ্ছে, তুমি তোমার ছেলের জন্য বউ খুঁজে রেখেছ?

একে বারে যে রাখিনি তা ঠিক না। তবে ভেবে রেখেছি।

মেয়েটা কে জানতে পারি?

এষা।

নামটা শুনে কয়েক মুহূর্ত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, চিনতে পারলাম না তো। কোন এষা? কার মেয়ে?

আরে তুমি ভুলে গেলে, আমার খালাত ভাইয়ের একমাত্র মেয়ে।

তোমার কোন খালাত ভাইয়ের মেয়ে বলত?

আরে বাবা, ও আবেদ ভাইয়ের মেয়ে। ওই যে গত বছর ফেব্রুয়ারীতে চট্টগ্রাম থেকে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ঢাকায় একুশে বইমেলায় বেড়াতে। ওই যে কয়েক দিন থাকল। প্রতিদিন বিকেলে বইমেলায় যেত আর এক গাদা করে বই কিনে আনত। এবার মনে পড়েছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে।

কিন্তু মেয়েটা...। কথা শেষ না করে আলী আহম্মেদ সাহেব আবার বললেন, সে যাই হোক। তোমার ছেলের সঙ্গে আলাপ করে দেখ, ছেলেকে মেয়ে দেখাও। ওর পছন্দ হলে আমার আপত্তি নেই।

স্বামীর কাছ থেকে পজেটিভ রেজাল্ট পেয়ে ইলেন বেগম সন্তুষ্ট হয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, তুমি দেখ, এষাকে দেখে সোহান এক কথায় রাজি হয়ে যাবে। ওকে তো আমি পেটে ধরেছি। আমি ওকে চিনি।

ঠিক আছে, তোমরা মা ব্যাটা রাজি থাকলে আমিও রাজি।

তাহলে আবেদ ভাইকে ফোন করে বলে দিই দু'একদিনের ভিতর যেন এষাকে নিয়ে ঢাকায় আমাদের এখানে বেড়াতে আসে?

ঠিক আছে বলে দাও। কথা শেষ করে আলী আহম্মেদ চৌধুরী বইটা পাশে রেখে বালিশটা বিছানায় ঠিক করে নিয়ে শুয়ে পড়লেন।

দু'দিন যেতে না যেতেই ইলেন বেগমের খালাত ভাই আবেদ সাহেব মেয়ে এষাকে নিয়ে সোহানদের বাসায় এসে হাজির হলেন। সকালে ডাইনিংয়ে বসে আলী আহম্মেদ চৌধুরী, ইলেন বেগম ও সোহান একসঙ্গে নাস্তা করছিল। এমন সময় ভাই ও ভাইজি এষাকে দেখে ইলেন বেগম ডাইনিং থেকে উঠে গিয়ে খুশিতে এষাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, মা তুমি ভালো আছ? তারপর আবার আবেদ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ভাই জান, তুমি কেমন আছ? আজ এতো দিন পরে বুঝি বোনের কথা মনে পড়ল?

আবেদ সাহেব মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, হ্যাঁ আমরা ভালো আছি। তারপর আলী আহম্মেদ চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাই সাহেব কেমন আছেন?

আলী আহম্মেদ চৌধুরী ডাইনিংয়ে রাখা টিসু বক্স থেকে একটা টিসু নিয়ে হাত মুছতে মুছতে উঠে এসে স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ আমরাও ভালো আছি।

ইলেন বেগম সোহানকে ডাইনিংয়ে বসে থাকতে দেখে বললেন, এই সোহান এদিকে আয়। তারপর আবেদ সাহেবকে দেখিয়ে বললেন, মনে আছে তোর আবেদ মামার কথা? সেই যে, তোর ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর আমরা সকলে কক্সবাজার যাওয়ার সময় চট্টগ্রামে দু'দিন বেড়ালাম।

সোহান উঠে এসে সালাম দিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। তারপর বলল, মামার তো দেখছি অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তখন মামা কত স্লীম ছিল। এখন তো দেখছি অনেক মুটিয়ে গেছেন।

আর কী বলব বাবা। স্লীম থাকার জন্য চেষ্টা তো কম করি না। ডাক্তার একবেলা থেকে বাড়িয়ে দু'বেলা রুটি খেতে বলেছে। তাই করছি কিন্তু কোনো উপকার পাচ্ছি না।

মামা রুটি কি ভাত খাওয়ার পরে খান না আগে খান? সোহান জানতে চাইল।

সোহান কথা শেষ করতেই এষা বলে উঠল, ঠিক নেই। আব্বু কখনো ভাত খাওয়ার আগেও খান আবার কখনো ভাত খাওয়ার পরেও খান।

এষার কথা শুনে উপস্থিত সবাই হো হো করে হেসে ফেলল। হাসি থামিয়ে কপট রাগের সঙ্গে ইলেন বেগম বললেন, তোমরা থাম তো। তারপর ভাই ও ভাইজিকে বললেন, তোমরা এসো আগে হাত মুখ ধূয়ে নাস্তা সেরে তারপর গল্প কর, রেস্ট নাও।

এদিকে এষার কথা শুনে এষার দিকে তাকাতে সোহান দেখল, সট জিন্সের প্যান্ট ও আটোসাটো একটা গেঞ্জি পরা ছেলেদের মতো ছোট করে চুল ছাঁটা কানে ও হাতে অসংখ্য রিং ও চুড়ি পরা মামার সঙ্গের সঙ্গিটা মেয়েলি কণ্ঠে কথা বলছে। মনে মনে ভাবল, একি পাগল না অন্য কিছু? ভালো করে দৃষ্টি দিতে মনে হলো বাইরে দিয়ে ছেলেছেলে মনে হলেও সম্ভবত ভিতরের দিক দিয়ে মেয়েই হবে।

হঠাৎ করে সোহানের চোখে চোখ পড়তে এষা ঠোঁটের কোনে হাসি ফুটিয়ে বিদ্যুতের মতো হায়, বলে সোহানকে চোখ মারল। সোহানকে চমকে উঠতে দেখে মুহূর্তের ভিতর একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে সোহানের একটা হাত নিজ থেকে ধরে হ্যান্ডশেক করে বলল, আমি এষা হোসেন। আপনি নিশ্চয় সোহান ভাই?

সোহান এমন অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কোনো রকমে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, জি আপনি ঠিকই ধরেছেন।

ধরতে আর পারলাম কোথায়। তারপর আস্তে আস্তে বলল, এসে যখন পড়েছি আপনাকে সারা জীবনের জন্যই ধরব। তখন দেখব ছুটতে পারেন কী না।

সোহান নিজের রুমে বসে কম্পিউটারে নিজের লেখা থিসিসটা সার্চ করছিল। এমন সময় হঠাৎ পিছন দিক দিয়ে এষা গলা জড়িয়ে ধরে বলল, কি করছেন?

বিদ্যুৎ চমকের মতো চমকে উঠে সোহান নিজের গলাটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, একি করছেন?

এষা সোহানের কথায় কর্ণপাত না করে বলল, বললেন না যে, কি করছেন?

নিজেকে গুছিয়ে নিতে নিতে সোহান বলল, একটা থিসিস দেখছিলাম।

এষার বাহু থেকে সোহান নিজেকে মুক্ত করে নেয়ার পর এষা সোহানের খাটে নিজের শরীর এলিয়ে দিয়ে বলল, কার থিসিস দেখছিলেন?

নিজের লেখা।

তাই! তা আপনার থিসিসের বিষয় কি?

তেমন কিছু নয়। এই তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে আমাদের দেশের উন্নতির অন্তরায় কি কি?

থিসিসের বিষয় শুনে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে নিজের শরীরের আড়মোড় ভেঙে নিয়ে বলল, ও... রেব বা...বা। আপনার থিসিসের বিষয় দেখি খুবই কঠিন বিষয় নিয়ে। ভবিষ্যতে দেশের বুদ্ধিজীবী হওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে না কি?

এষার কথা শুনে ওর দিকে তাকাতে সোহান দেখল, আজ মেয়েটা গেঞ্জি প্যান্ট ছেড়ে শাড়ী পরেছে। তাও আবার পাতলা ফিনফিনে প্রিন্টের ছাপার উপর গোলাপি রংয়ের একটা জর্জেটের শাড়ী। শাড়ীর সাথে ম্যাচিং করে ব্লাউজ এবং হাতে ও কানেও পড়েছে ম্যাচিং করে। এষা অসুন্দরী বললে মিথ্যা বলা হবে, শাড়ী পড়তে ওকে আজ আরো বেশি সুন্দর লাগছে। সোহানের জায়গায় আজ অন্য যে কোনো ছেলে হলে মাথা ঘুরে যেত। কিন্তু সোহানের কেন যেন এ মুহূর্তে এষাকে একদম সহ্য হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এখন এ মুহূর্তে মেয়েটা ওর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ও খুব খুশি হত।

সোহানকে কথা না বলে চুপ করে বসে থাকতে দেখে এষা আবার বলল, কই আমার কথার উত্তর দিলেন না যে?

বাস্তবে ফিরে এসে সোহান বলল, কোন কথার?

ওই যে বললাম, ভবিষ্যতে দেশের বুদ্ধিজীবী হবেন কিনা?

এখনো ভেবে দেখিনি। এক কথায় উত্তর দিল সোহান।

ঠিক আছে সেটা আপনার ব্যাপার। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে ঘরটা দেখিয়ে আবার বলল, এটা বুঝি আপনার ঘর?

জি হ্যাঁ।

খাটটা দেখিয়ে বলল, এ খাট মানে বিছানাও তাহলে আপনার?

বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে সোহান বলল, অবশ্যই।

তারপর নিজের মাথার নিচের বালিশটা দেখিয়ে বলল, এটাও নিশ্চয় আপনার?

কেন বলুন তো? পাল্টা প্রশ্ন করল সোহান।

কারণ এগুলো থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। তারমানে আপনার শরীরের গন্ধ। তারপর আবার বলল, আপনার শরীরের গন্ধটা তো বেশ মিষ্টি।

আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বুঝে আপনার কাজ নেই। যখন সময় আসবে তখন আমিই সব কিছু হাতে কলমে বুঝিয়ে দিব। তারপর আবার বলল, এ ঘরে এ বিছানায় আপনি একাই থাকেন?

আপনার কি মনে হয় এ সময় আমার দোগলা থাকার কথা?

না তা মনে করছি না। তবে আপনার মন চাইলে আজ এখনিই এই বিছানায় আমার পাশে শুয়ে এক সঙ্গে দোগলা শোয়ার মজাটা নিতে পারেন। কথা শেষ হতে এষার ঠোঁটের কোণে চোরা হাসির চিলিক খেলে গেল।

এষার কথা শুনে সোহানের সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। মনে মনে বলল, মেয়ে বলে কি! একটু সুযোগ পেলে তো দেখছি এই মেয়ে ওকে ঘোলা ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়বে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, দেখুন কিছু মনে করবেন না আপনি আমাদের অতিথি। বাসার কেউ হঠাৎ এ ঘরে এসে পড়লে, আপনার অবস্থা দেখলে, আমাদের ভুল বুঝতে পারে।

নিঃসংকোচে এষা বলল, তা পারে।

তাহলে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত নয় কি?

তাও ঠিক। তারপর আর একটু আরাম করে বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশের উপর হাত রেখে মাথাটা উঁচু করে এষা আবার বলল, তবে তার দরকার নেই।

অবাক চোখে সোহান বলল, তার মানে!

তার মানে হলো, এখন এ মুহূর্তে এ বাড়িতে আমি আর আপনি ছাড়া আর কেউ নেই।

কেন? মা আপনার বাবা মানে মামা!

ওরা দু'ভাই বোনে লাঞ্চ সেরে অফিস থেকে আংকেলকে নিয়ে শপিংয়ে গেছে। ফিরতে কম করে হলেও সন্ধা সাতটার আগে ফিরতে পারবে না।

কিন্তু বাড়িতে হাউস হোস্টরা আছে।

তা আছে তবে অ্যাংটি বাইরে যাওয়ার সময় ওদের বলে গেছেন, আমরা না ডাকা পর্যন্ত যেন ওদের কেউ উপরে না আসে। অতএব বুঝতেই পারছেন, আমি আর আপনি ইচ্ছা করলেই এ মুহূর্তে ইচ্ছা পূরণ খেলাও খেলতে পারি?

কথাটা শুনে সোহানের মাথা ঘুরে গেল। আরো বেশি ঘুরে গেল এষাকে বিছানার উপুড় হয়ে শুয়ে বুক চিতিয়ে মাথা উঁচু করে ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখে। মনে মনে সুযোগ খুঁজতে লাগল কিভাবে এই মেয়ের হাত থেকে বাঁচা যায়। হঠাৎ কী মনে হতে মুখে হাসি টেনে সোহান বলল, আপনি বসুন তারপর বাম হাতের কনে আঙ্গুলটা দেখিয়ে বলল, আমি একটু আসছি। চেয়ার থেকে উঠার সময় এষার অগোচরে কম্পিউটারের পাশে রাখা নিজের মোবাইলটা নিয়ে বার্থরুমে গিয়ে ঢুকল।

অনেকক্ষণ ধরে ফোনটা বাজছে। কেউ ধরছে না দেখে রুমানা হাতের কাজটা দ্রুত সেরে নিয়ে ফোনটা রিসিভ করল।

ফোন রিসিভ করে রুমানা বলছি বলার সঙ্গে সঙ্গে ফোনের ওপাশ থেকে মিনতির স্বরে ভেসে এলো, প্লিজ রুমানা আমাকে একটু সাহায্য কর। আমি খুব বিপদে আছি।

অনুরোধটা শুনে চমকে উঠল রুমানা। গলাটা পরিচিত কিন্তু খেয়াল করতে পারছে না কে হতে পারে। বলল, আপনি কে বলছেন প্লিজ?

আমি আমি আমিনুলের বন্ধু, সোহান বলছি।

নামটা শুনে আর একবার চমকে উঠল রুমানা। ভাবল, ওনাকে না আমাকে ফোন করতে নিষেধ করেছি? পর মুহূর্তে আবার ভাবল, সোহান সাহেব ফোনে সাহায্য চাচ্ছেন! ওনি এখন কোথায়? বিপদের কথ বলছেন। কি বিপদেই বা আছেন?

রুমানাকে চুপ করে থাকতে দেখে ফোনের ওপাশ থেকে সোহান আবার বলল, প্লিজ রুমানা, তুমি এ মুহূর্তে আমাকে একটু সাহায্য না করলে আমার জীবনে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

সোহানের দ্বিতীয়বার সাহায্য চাওয়ার আহ্বানে বাস্তবে ফিরে এসে বিস্ময় ভরা কণ্ঠে রুমানা বলল, আপনি এখন কোথায়? আর আপনার বিপদই বা কি?

সে সব কথা পরেও শুনতে পারবে। এখন তোমাকে সংক্ষেপে শুধু বলছি, একটা মেয়ে আমার পিছনে জোঁকের মতো আজ কয়েক দিন ধরে লেগে আছে। আজ এখন আমাদের বাসা খালি পেয়ে...। কথাটা শেষ না করে আবার বলল, এ মুহূর্তে আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলতে পারব না। তোমার কাছে অনুরোধ আমি এখন তোমাকে যা যা বলতে বলছি কিছুক্ষণ পরে ফোনে মেয়েটাকে তাই শুধু বলবে। তুমি যদি আজ আমার এ উপকারটা কর তাহলে আমি তোমার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

রুমানা সোহানের কথার আগামাথা কিছুই বুঝল না। শুধু বুঝল বেচারা খুব বিপদে আছে। তাই নিজেকে কোনো রকম গুছিয়ে নিয়ে বলল, কি বলতে হবে?

মেয়েটাকে আমার একদম পছন্দ না। কিন্তু আমাদের রিলেটিভ হওয়ায় ও সহজেই আমদের বসায় আসতে পারে। আর তাই নানা বাহানায় আমার কাছে এসে আমাকে ওর প্রতি দূর্বল করার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করে এবং করছে। ওর হাত থেকে একমাত্র তুমিই আমাকে বাঁচাতে পার।

আমি! বিস্ময় ভরা কণ্ঠে রুমানা বলল।

দেখ, এখন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় না। তোমাকে মেয়েটার কাছে কি বলতে হবে আমি সংক্ষেপে বলছি মন দিয়ে শোন। কয়েক মুহূর্ত পর সোহান আবার বলল, পাঁচ মিনিট পর তুমি আমার নম্বরে ফোন দিবে। নিজের মোবাইল নম্বরটা বলে নিয়ে আবার বলল, আমি ফোন ধরব না। মেয়েটা ফোন ধরলে তুমি প্রশ্ন করবে, আপনি কে? সোহানের ফোন আপনার হাতে কেন? সোহান কোথায়? পরপর এই ধরনের প্রশ্ন করতে থাকবে। ও উত্তর দিলে আবার পাল্টা প্রশ্ন করবে।

ও যদি তোমাকে প্রশ্ন করে আপনি কে? ওর সঙ্গে আপনার কিসের সম্পর্ক? ইত্যাদি। তাহলে তখন বলবে, আমি ওর হবু স্ত্রী, আমরা দু'জন দু'জনকে ভালোবাসি। এই ধরনের কথা বলে মেয়েটাকে বিশ্বাস করাবে। তোমার কথা শুনে ও যেন আমার জীবন থেকে নিজে নিজেই সরে যায়। আবারও অনুরোধ করছি, তুমি একটুপর আমার মোবাইলে ফোন করে মেয়েটার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবে। কথা শেষ করে রুমানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল।

সোহান ফোনের লাইন কেটে দেওয়ার পর রুমানা বাস্তবে ফিরে চিন্তা করতে লাগল, আসলে ব্যাপারটা কী হচ্ছে? সোহান ওর সাথে ছলনা করছে না তো? ওর কথা শুনে, বিশ্বাস করে আবার কোনো ভুল করতে যাচ্ছি না তো? কয়েক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করে নিয়ে নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিল, না ও ফোন করবে না। নেড়া বেলতলায় একবারই যায়। জীবনে যে ভুল একবার করেছি, সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি। কথাটা ভেবে রুমানার শরীর শিউরে উঠল। দু'চোখ বেয়ে নিজের অজান্তে দু'ফোটা অশ্রু বেরিয়ে আসল দু'চোখ দিয়ে।

সোহান বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, এষা ওর দিকে মুখ করে ওর বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে একই অবস্থায় একটা ম্যাগাজিন দেখছে। বড় গলার ব্লাউজের উপর দিয়ে ওর স্তন্য যুগলের ভাঁজই শুধু দেখা যাচ্ছে না, পারলে যেন ও দুটো ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসবে এমন অবস্থা। তার উপর শাড়ীর আঁচলটাও বিছানায় পড়ে আছে। সোহানের আর বুঝতে বাকি রইল না যে, এটা এষার ইচ্ছাকৃত ভুল ছাড়া আর কিছু না। এক ফাঁকে মোবাইলটা কম্পিউটারের পাশে রেখে একটু ব্যস্ততা দেখিয়ে বলল, এষা তুমি আছ তো?

সোহানের কথায় চমকে উঠার ভান করে এষা একটু নড়েচড়ে নিজেকে গোছাতে গোছাতে বলল, কেন আপনি এখন আবার কোথায় যাচ্ছেন?

আমি নিচে যাব আর আসব। তুমি ততক্ষণ ম্যাগাজিনটা দেখতে থাক। কথা শেষ করে এষাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সোহান ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মুহূর্ত পরই সোহানের মোবাইলটা "প্রথমত আমি তোমাকে চাই" গানের সুরে বেজে উঠল। পরপর দু'তিন বার বেজে উঠতে কী মনে করে যেন এষা বিছানা থেকে উঠে এসে মোবাইলটা হাতে নিয়ে বিদ্যুৎ শকের মতো শক খেল। দেখল, মোবাইলের স্ক্রীনে "তোমাকে চাই রুমানা" লেখা একটা শব্দ লাইন মোবাইলের স্ক্রীনের আলোয় জ্বল জ্বল করে জ্বলে আছে। মুহূর্তের মধ্যে এষার নিজের ভিতর সিডরের চেয়েও প্রচন্ড গতির একটা ঝড় বয়ে গেল। মনে হলো যেন, সেই ঝড়ে ওর সব কিছু তৃণের মতো উড়ে গেছে ওর নিজের আয়োত্বের বাইরে।

মোবাইলে "প্রথমত আমি তোমাকে চাই" গানের কলিটা অনবরত বিরতিহীন ভাবে বেজে চলেছে। শেষে কী মনে করে রিসিভ বাটনটা চেপে বলল, হ্যালো, কাকে চাচ্ছেন?

ফোনে সত্যি সত্যি মেয়েলি কণ্ঠটা শুনে চমকে উঠলেও মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে ফোন কর্তা বলল, আপনি কে বলছেন? নম্বরটা বলে আবার বলল, এটা সোহানের নম্বর না?

জি হ্যাঁ, এটা সোহানের ফোন। আমি ওর কাজিন।

ঠিক আছে কিন্তু সোহানের ফোন আপনি ধরলেন কেন? সোহান কোথায়?

ফোন কর্তার গলার স্বর কিছুটা গরম মনে হলো এষার কাছে। সামলে নিয়ে বলল, দেখুন আপনি শুধুই আমাকে ভুল বুঝছেন। আসলে সোহান আমাকে ওর ঘরে রেখে কী একটা দরকারে যেন নিচে গেছে। বলে গেছে এক্ষুণী আসবে।

কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে ফোন কর্তা একই স্বরে আবার বলল, তার মানে আপনি একেবারে সোহানের বেডরুমে! সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর আর একটু উঠিয়ে ফোন কর্তা আবার বলল, সত্যি করে বলুন তো, আপনি আসলে সোহানের কেমন কাজিন হোন?

ফোন কর্তার এবারের কথাটা এষার ইগোতে যেয়ে লাগল। ওর মনে হলো মেয়েটা যেন ওকে ইনসাল্ট করে কথাটা বলল। কী যেন ভেবে নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, আগে আপনি বলুন তো আপনি কে?

সেটা আপনার জানার কি দরকার?

আপনার যেমন দরকার আমি সোহানের কেমন কাজিন হই। তেমনি আমারও জানা দরকার আপনি সোহানের কি হোন?

সোহানকেই জিজ্ঞেস করবেন, আমি ওর কি হই।

তা না হয় জিজ্ঞেস করব। কিন্তু আপনি তো আপনার নামটাই এখন পর্যন্ত বললেন না। আমি কিভাবে সোহানের কাছ থেকে আপনার কথা জানব?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ফোন কর্তা মেয়েটি বলল, আমার নাম, রুমানা।

রুমানা নামটা শুনে এষা বার কয়েক মনে মনে আওড়াল। তারপর একটু সময় নিয়ে বলল, আমি ওর মামাতো বোন এষা। আমরা চট্টগ্রামে থাকি। ফুপি বাবাকে ফোনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় তার বাসায় আসতে বলল তাই বাবা ও আমি আজ ক'দিন হলো সোহানদের বাসায় আছি। তারপর আবার বলল, কিছু মনে করবেন না, ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি?

কিছুক্ষণ নিরব থেকে রুমানা বলল, করুন।

কথা দিন মাইন্ড করবেন না?

কথাটা কি মাইন্ড করার মত?

তা ঠিক না।

তাহলে মাইন্ডের কথা বলছেন যে?

না মানে আপনি যদি আমাকে ভুল বুঝে মাইন্ড করে প্রশ্নের উত্তরটা না দেন।

উত্তরটা জানা কি আপনার জন্য খুবই দরকার?

হ্যাঁ হ্যাঁ। উত্তরটা দিলে খুশি হব।

ঠিক আছে বলুন, আপনি কি জানতে চান?

না মানে, সোহানের সাথে আপনার কি সম্পর্ক? না মানে, ওর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?

কেন বলুন তো? বিস্ময় ভরা কণ্ঠে রুমানা বলল।

এষা রুমানার কথায় কর্ণপাত না করে অনুরোধের স্বরে আবার বলল, প্লিজ, আপনি কিন্তু আমার কথার উত্তর দিবেন বলেছেন?

মেয়েটার কণ্ঠে জানার ব্যাকুলতা দেখে রুমানা বলল, আপনি কি জানেন, সোহান বিয়ে করতে যাচ্ছে?

কেন জানব না? অবশ্যই জানি। তারপর বিস্ময় ভরা কণ্ঠে এষা আবার বলল, আপনি জানেন কিভাবে?

আসল ব্যাপারটা কি হয়েছে খুলে বলুন তো? এষাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রুমানা বিস্ময় ভরা কণ্ঠে আবার বলল, আমার সঙ্গে বিয়ে আর আপনি বলছেন, আমি জানলাম কিভাবে!

কথাটা শুনে এষা নিজের দু'কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। ওর মনে হলো ও যা শুনল তা ভুল শুনেছে। কানে শোনা যদি সঠিক হয় তাহলে, রুমানা যা বলছে তা ভুল বলছে। মিথ্যা বলেছে। এ হতে পারে না। বিয়ের আগে কম বেশি সব মানুষেরই একটু আধটু অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে ; চট্টগ্রামে এরকম দু'চারটে সম্পর্কের মানুষ ওরও আছে। তাতে কি? এ সম্পর্ক তো আর বিয়ে পর্যন্ত গড়াবে না। তাছাড়া ওর ফুপিই তো সকালে ওকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে আদর করতে করতে মুখটা ওর কানের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, মামনি বিকেলে আমি তোমার ফুপা ও তোমার বাবা একটু শপিংয়ে বেরোব। বাসায় সোহান থাকবে। তুমি নিজের মানুষ মনে করে ওকে একটু সঙ্গ দিও। আমার ছেলেটা আমেরিকায় দীর্ঘদিন থেকে আসলেও

এখনো কেমন যেন সেকেলেই রয়ে গেছে। আমি যেন ফিরে এসে দেখি ওর সঙ্গে তোমার একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যাতে ভবিষ্যতে তোমাদের দু'জনের দু'জনকে বুঝতে কোনো সমস্যা না হয়। এষা ভাবল, কিন্তু এ মেয়েটা একি বলছে!

এমন সময় সোহান ঘরে ঢুকে এষার দিকে একটা চুইন গামের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কার ফোন?

সোহানের কথায় বাস্তবে ফিরে এষা কোনো রকমে মোবাইলটা সোহানের হাতে দিয়ে বলল, তোমার ফোন।

সোহান অনেকক্ষণ আগেই চলে এসেছিল। এতক্ষণ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ফোনে এষা ও রুমানার মধ্যেকার কথা শুনছিল। অনেকক্ষণ এষার কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে ঘরে ঢুকে ওকে ফোন কানে দিয়ে হা করে উদাস হয়ে ভাবতে দেখে এষার কাছে নিজের উপস্থিতির জানান দেয়ার জন্য পকেট থেকে চুইন গামের প্যাকেটটা বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে কার ফোন জিজ্ঞেস করল।

এষা ফোনটা ওর হাতে দিতে সোহান স্ক্রীনে নামটা একবার দেখে নিয়ে মুখে একরাশ আনন্দের ছটা ফুটিয়ে বলল, হ্যালো জান, তুমি কেমন আছ?

সোহানের কথাটা শুনে রুমানা যেন এতক্ষণে বাস্তবে ফিরে এলো। মনে মনে ভাবল, হায় হায় এ আমি কি করলাম? এ আমি কি শুনছি? ভয় ও লজ্জায় ওর সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল। সমস্ত মুখমণ্ডল সিঁদুরের মতো লাল হয়ে উঠল। যেন যে কোনো মুহূর্তে একটু ছোঁয়া পেলেই ফেটে পড়বে। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আগে ভালো ছিলাম। তবে...। বলে কথাটা শেষ না করে চুপ হয়ে গেল।

সোহান আবার বলল, তবে মানে কি? কথাটা শেষ কর।

কোন কথাটা?

এই যে একটু আগে যেটা বলতে গিয়ে থেমে গেলে।

নিজেকে সামলে নিয়ে রুমানা বলল, আমি পারব না।

সোহান ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, জান ঠিক আছে। তোমাকে এখন বলতে হবে না। আমি পরে তোমাকে ফোন দিচ্ছি। কথা শেষ করে সোহান লাইন কেটে দিয়ে ঘুরে দেখল এষা ওর অজান্তে কখন যেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। বড় করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ে নিজে নিজে হাসতে লাগল।

সন্ধ্যায় শপিং করে বাসায় ফিরে ইলেন বেগম এষাকে কাছে ডেকে ওর জন্য কিনে আনা কাপড়ের ব্যাগগুলো ধরিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ তো মামনি ওগুলো তোমার পছন্দ হয় কী না, ফিটিং হয় কী না। কথা শেষ করে এষার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মুখে মলিনতার ছাপ দেখে কাছে বসিয়ে আবার বললেন, কি ব্যাপার মামনি, তোমার কি শরীর খারাপ করেছে?

এষা ফুপির কথার উত্তরে কী বলবে না বলবে ভেবে পাচ্ছে না। শুধু বুক কাপিয়ে বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না শরীর ঠিক আছে।

এষার উত্তর দেয়ার ধরণ দেখে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখে ওকে নিজের আরো কাছে টেনে নিয়ে মুখটা কিছুটা এষার মুখের কাছে নিয়ে কৌতূহল দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করলেন, এ্যানিথিং রং?

ইয়েস ফুপি, সামথিং ইজ ঃং রং।

হুয়াট ডু ইউ! আশ্চর্য দৃষ্টিতে ইলেন বেগম বললেন। তারপর আবার বললেন, ঘটনাটা কি ঘটেছে আমাকে খুলে বলবে তো।

ওর মুখের অবস্থা দেখে ফুপি কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছেন বিষয়টা বুঝতে পেরে এষার কষ্টটা যেন আরো বহুগুণ বেড়ে গেল। ও ফুপির সামনে নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আমি তোমাকে বলতে পারব না। তুমি বরং সোহান ভাইয়াকে জিজ্ঞেস কর। কথাটা শেষ করেই ইলেন বেগমকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

এষার কথা শুনে এবং অবস্থা দেখে ইলেন বেগমের মনের ভিতর নানা প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগল। ভাবলেন, এষাকে একলা পেয়ে ছেলে শেষে কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলে নি তো? আবার ভাবলেন, ঘটালেই বা ক্ষতি কি? ওরা দু'জন যেন দু'জনের কাছাকাছি আসতে পারে, যাতে দু'জন দু'জনকে বুঝতে পারে, তার জন্যই তো নিজেরা প্লান করে ওদেরকে সে সুযোগ করে দেয়ার জন্য সবাইকে নিয়ে শপিংয়ে গিয়েছিলেন। আর এতে এষার মন খারাপেরই বা কী আছে। সোহান যদি ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওর সঙ্গে কিছু করেই থাকে তাতে তো দোষের তেমন কিছু নেই। আমি তো চাই সোহান যেন ওকে নিজের স্ত্রী হিসেবে সহজেই মেনে নেয়। কেন না, সোহান মত দিলেই একটা ভালো দিন দেখে ওদের দু'জনকে সারা জীবনের জন্য এক সঙ্গে বেঁধে দেব। কী মনে হতে আবার ভাবলেন, না কী আমি যা ভাবছি তার উল্টোটা হয়েছে। মনে মনে বললেন, আসল ব্যাপারটা জানা খুবই

এ্যাসেনশিয়াল। ভাবলেন রাতে খাওয়ার টেবিলে দু'জনের আচরণ খেয়াল করলেই মোটামুটি কিছুটা আন্দাজ করা যাবে।

খাওয়ার টেবিলে ইলেন বেগম লক্ষ করলেন, সোহান আগ বাড়িয়ে এষার সঙ্গে কথা বলছে। আর এষা যেন ওকে কিছুটা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। ওদের দু'জনের আচার আচরণ দেখে ইলেন বেগমের মনে হলো তার প্রথম ধারণাটাই ঠিক। মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও মনে মনে খুশিই হলেন। তারপরও সিওর হওয়ার জন্য ভেবে রাখলেন, রাতে শোয়ার আগে একবার সোহানের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে নিবেন।

সোহান খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে এসে কম্পিউটারে ইমেল চেক করছিল। এমন সময় ইলেন বেগম ঘরে ঢুকে বললেন, কি করছিস বাবা?

সোহান কম্পিউটার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তেমন কিছু না। তারপর বিছানা দেখিয়ে বসতে বলে বলল, কিছু বলবে?

ছেলের আগ্রহ দেখে ইলেন বেগম নিজের ধারণা সঠিক ভেবে মুখে হাসি হাসি ভাব ফুটিয়ে খাটে বসে বললেন, হ্যাঁ, তোর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

বল কি কথা? স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সোহান বলল।

তুই বড় হয়েছিস। বিদেশ থেকে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরেছিস। তুই আমাদের একমাত্র সন্তান। আমরা মানে তোর বাবা ও আমি চাই শীঘ্রই তোর বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ আনতে।

মার কথা শুনে সোহান হেসে ফেলে বলল, তাতো খুব ভালো কথা কিন্তু তার জন্য আমাকে কি করতে হবে?

তোকে কিছু করতে হবে না। শুধু আমি যা জানতে চাই তা জানালেই চলবে।

বল, কি জানতে চাও?

এষাকে তোর কেমন লাগে?

এষাকে কেমন লাগে মানে! এষা কি খারাপ মেয়ে নাকি যে ওকে কেমন লাগে বলছ?

ইলেন বেগম ছেলের কথায় খুশি হয়ে আনন্দে বলেই ফেললেন, তার মানে ওকে যদি আমরা তোর বউ করে ঘরে আনি তাতে তোর কোনো আপত্তি নেই?

কথাটা শুনে মুহূর্তের মধ্যে সোহানের মুখচ্ছবি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে বলল, তুমি যেভাবে বলছ, এষাকে নিয়ে ওভাবে তো আমি এখনো ভেবে দেখিনি।

তারমানে! ইলেন বেগম বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন।

তার মানে আমি স্ত্রী হিসেবে অন্য একজনকে ভাবি।

কথাটা শুনে ইলেন বেগমের মনে হলো তিনি যেন ভুল শুনলেন। আবার ভাবলেন, নাকি সোহান ভুল শুনে ভুল উত্তর করল। নিজের ভিতর কেমন যেন সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এতোদিন মনে মনে কী ভাবলেন, কী স্বপ্ন দেখলেন, আর আজ সোহান কী বলছে। কত আশা করে স্বামীকে রাজি করিয়ে ভাইকে বলে এষাকে ঢাকায় নিয়ে আসলেন। অথচ এক মুহূর্তের মধ্যে ছেলে তার সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিল। কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললেন, স্ত্রী হিসেবে কাকে নিয়ে ভাবিস জানতে পারি?

অবশ্যই জানতে পার।

তাহলে বল, কে সেই মেয়ে?

বলব। তবে তার আগে আমাকে কয়েকটা দিন সময় দাও। তখন আমি নিজ থেকেই তোমাকে মেয়েটার কথা বলব।

এখন বলতে সমস্যা কি? ইলেন বেগম পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

একটু সমস্যা আছে। তারপর ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে একটা হাত মার একটা হাতের উপর রেখে রেখে আশ্বস্তের সঙ্গে বলল, কয়েকদিন সবুর কর। আমিই তোমাকে সব বলব।

অগত্যা হতাশাগ্রস্থ হৃদয়ে ইলেন বেগম ছোট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছেলের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সোহান একটা বিশেষ কাজে নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে ফার্মগেটে এসে ট্রাফিক জ্যামে পড়ে সিগন্যাল উঠার অপেক্ষা করতে লাগল। কাজের সময় ট্রাফিক জ্যাম সবার কাছেই অসহ্য লাগে। কিন্তু আজ কেন যেন সোহানের কাছে ভালো লাগছে। ফার্মগেটের ট্রাফিক জ্যাম যে কি ধরনের জ্যাম তা কেবল যারা এ রোডে সবসময় যাতায়াত করে তারাই ভালো জানে। এ জ্যাম হলো, জটলা জ্যাম। একবার সিগন্যাল পড়লে যেন উঠার কথা ভুলে যায়। তারপরও আজ সোহানের ভালো লাগছে। জ্যামে বসে বসে ভালো লাগার কারনটা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করতে লাগল। গাড়ির জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাতে দেখল আজ আকাশ যেন নতুন বউয়ের মতো

নিজেকে মেঘ মালা দিয়ে সাজিয়েছে। আকাশের বুকে মাঝে মাঝে সূর্য মেঘেদের ফাঁকি দিকে নিজের জানান দিচ্ছে। প্রকৃতিতে ঠাণ্ডা মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। মনে মনে বলল, এখন যেন কোন মাস? পর মুহূর্তে মনে হলো, এখন ডিসেম্বর, তার মানে শীতের শুরু। এমন সময় হঠাৎ নিজের গাড়ির সামনে দৃষ্টি পড়তে চমকে উঠল। দেখল, পাবলিক ক্রসিং দিয়ে কলেজ ড্রেসে রুমানা হেঁটে যাচ্ছে। ভাবল স্বপ্ন দেখছি না তো। পর মুহূর্তে মনে হলো, না যা দেখছি তা বাস্তব। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বার করে ডাকল, এই রুমানা, এই রুমানা।

নিজের নাম ধরে কেউ হঠাৎ ডেকে উঠতে রাস্তার মাঝখানেই রুমানা দাঁড়িয়ে পড়ে পিছনে তাকাল। পিছন ঘুরে তাকাতেই দেখল, গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বার করে হাসি মুখে একটা সুন্দর হ্যান্ডসাম ছেলে ওকে হাতের ইশারায় ডাকছে। এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে ছেলেটাকে চিনতে পারল। হ্যাঁ, এতো বড় ভাইয়ার বন্ধু সোহান। হ্যাঁ ওকেই তো ডাকছে। ভাবল ওর ডাকে ওর কাছে যাওয়া কি ঠিক হবে?

রুমানা ওর দিকে তাকাতেই সোহান আবার হাক দিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি চলে এসো। এক্ষুণি সিগন্যাল উঠে যাবে। এক্সসিডেন্ট হবে তো।

ছেলেটার শেষের কথাটা রুমানার কাছে কেমন যেন আতংকিত বলে মনে হলো। কী মনে করে কখন যে সোহানের গাড়ির কাছে চলে এসেছে বুঝতেই পারেনি।

গাড়ির কাছে রুমানা আসতে সোহান গাড়ির সামনের ওর পাশের দরজাটা ভিতর দিয়ে খুলে দিয়ে বিচলিত কণ্ঠে বলল, তাড়াতাড়ি উঠে এসো। ওই সিগন্যাল উঠে গেল বলে।

রুমানা নির্বিকার কণ্ঠে গাড়িতে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে সিগন্যাল উঠে গেল এবং সোহান গাড়ি স্টাট দিয়ে দ্রুত সামনে এগিয়ে গেল। সংসদ ভবনের সামনে এসে গাড়ি সাইড করে সোহান বলল, কি ব্যাপার কোনো কথা বলবে না?

সোহানের ডাকে গাড়িতে উঠে পড়ে রুমানার যেন লজ্জায় মরে যাওয়ার জোগাড় হলো। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিল। ভাবলও একি করল? ডাকল বলে গাড়িতে উঠে পড়তে হবে। সোহান সাহেবই বা কি ভাববে? এক বারের জন্য পর্যন্ত না বললাম না।

রুমানাকে কথা না বলেল চুপ করে মাথা নিচু করে বসে থাকতে দেখে

সোহান আবার বলল, কি ব্যাপার কোনো কথা বলবে না?

নিজেকে সামলে নিয়ে এক পলক সোহানের দিকে তাকিয়ে নিয়ে রুমানা বলল, কি বলব?

রুমানার পাল্টা প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলে সোহান বলল, ঠিক আছে তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমিই বলছি, কোথায় যাচ্ছিলে?

বাসায়।

কলেজ থেকে ফিরছিলে?

ঠিক তা নয়। কলেজ শেষে কোচিং করে ফিরছিলাম।

তুমি বুঝি তেজগাও কলেজে পড়?

জি হ্যাঁ।

কিসে? কোন ইয়ারে?

ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে।

ও...তাই। তারপর আবার বলল, দেখ তোমার সঙ্গে আজ যেহেতু আল্লাহ দেখা করিয়ে দিলেন, তাই বলছি আজ যদি একটু দেরি করে বাড়ি ফিরো তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে?

বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে সোহানের চোখে দৃষ্টি ফেলতে রুমানা দেখল, সোহানের চোখের দৃষ্টিতে লোভের কোনো কালো ছাঁয়া নেই। ওর দুটি দৃষ্টি যেন আকুল হয়ে আছে ওর কাছ থেকে সন্তুষ্ট জনক উত্তরের আশায়। দৃষ্টিটা নামিয়ে নিয়ে অনুচ্চস্বরে শুধু বলল, কেন?

তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা আছে।

কথাটা শুনে রুমানাও মনে মনে ভাবল, এটাই উত্তম সুযোগ। ছেলেটাকে ওর পিছন থেকে সরানোর। ওর ভালো চোখে আমাকে হঠাৎ দেখে হয়তো আমাকে ভালো লেগেছে। কিন্তু ওতো আমার আসল পরিচয় জানে না। আসল পরিচয় জানা তো দূরের কথা যখন, শুধু জানবে আমি আমিনুল ভাইয়াদের আপন কোনো রিলেটিভ নই। শুধুমাত্র ওদের আশ্রিতা। আমার বলার মত রা যাওয়ার মত কোনো ঠিকানা বা জায়গা নেই। তখন ভূত দেখার মত বড়লোকের এই দুলালের দ্রুত ছুটেপালন ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।

কি হলো কিছু বলছ না যে?

আবারও সোহানের কথায় বাস্তবে ফিরে এসে নিজেকে সামলে নিয়ে রুমানা বলল, আপনার মোবাইলটা একটু দিবেন?

সোহান কোনো প্রশ্ন না করে মোবাইলটা রুমানার হাতে দিতে রুমানা একটা নম্বরে কল দিয়ে বলল, কে, ছোট ভাই?

ফোনের ওপাশ থেকে ফরিদুল বলল, হ্যাঁ, কেন কি হয়েছে? তুই এখন কোথায়?

তুমি মাকে বলো, আজ কোচিং থেকে ফিরতে আমায় একটু দেরি হবে। যে স্যারের কাছে কোচিং করি তার সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে। কাজটা শেষ করেই ফিরব। মা যেন কোনো চিন্তা না করে, কেমন?

ফরিদুল বলল, ঠিক আছে। সাবধানে থাকিস।

কথা শেষ করে রুমানা ফোনের লাইনটা কেটে দিয়ে সোহানের কাছে মোবাইল ফিরিয়ে দিয়ে বলল, এবার দেরি হলে সমস্যা নেই। তবে শর্ত হলো এক ঘন্টার মধ্যে আপনার কথা শেষ করে আমাকে বিদায় দিবেন।

রুমানার সম্মতি পেয়ে সোহানের মনে হলো আকাশের চাঁদ যেন ওর হাতে নেমে এসেছে। ধরা দিয়েছে। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দ্রুত ছুঁটে চলল ধানমন্ডির দিকে। লেকের এক পাশে গাড়ি পার্ক করে বেলি ব্রিজ দিয়ে হেঁটে রেস্টুরেন্টে গিয়ে একটা পছন্দমত নিরিবিলি জায়গা দেখে বসল। তারপর রুমানার উদ্দেশ্যে বলল, কি খাবেন?

আমার পছন্দের বিশেষ কিছু নেই। আপনি যেহেতু আজ আমাকে নিয়ে এসেছেন আপনার পছন্দই আমার পছন্দ।

ঠিক আছে। তারপর দুটো চটপটি, দুটো ফোচকা ও দু'টো কোল্ড ড্রিংসের অর্ডার দিয়ে বলল, এগুলোতে কোনো সমস্যা নেই তো?

সমস্যা থাকলেই বা কি আপনি যেহেতু অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন সেহেতু খেতে তো হবেই।

সোহান নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, সরি। আমার আগে জেনে নেয়া উচিত ছিল। তারপর আবার বলল, ঠিক আছে আপনার যদি সমস্যা থাকে তাহলে অর্ডার ক্যানসেল করে দেই।

ঠোঁটের কোনে হাসির রেশ টেনে রুমানা বলল, ধন্যবাদ। তার আর দরকার নেই। এমনি বললাম। তারপর আবার বলল, এবার বলুন, আমার সঙ্গে আপনার কি জরুরী কথা?

সোহান অনুমতি পেয়ে রুমানার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, দেখ রুমানা,... কথাটা শেষ না করে বলল, সরি। আপনাকে তুমি বলে ফেললাম।

না ঠিক আছে। আমি আপনার ছোটই হব। আপনি আমাকে তুমি করে

বলতে পারেন। অনুমতি দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। তারপর আবার বলল, হ্যাঁ যা বলছিলাম। বলুন কি বলছিলাম।

তোমাকে আমার ভালো লাগে। সরাসরি সোহান বলল। তারপর আবার বলল, এর আগেও একদিন কথাটা বলেছিলাম। তুমি হয়তো সে দিন আমার কথাটা সিরিয়াসলি নাওনি। তাই আজ আবার বলছি এবং এও বলছি, আমি কথাটা সিরিয়াসলি বলছি।

ঠিক আছে আপনার কথা আপনি বলতে পারেন। আপনার চোখে আমাকে ভালো লেগেছে তাই আপনি আপনার ভালো লাগার কথা আমাকে জানিয়েছেন। তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তবে আপনি হয়তো এও জানেন, এক জনের ভালো লাগলেই যে অন্য জনেরও তাকে ভালো লাগতে হবে এমন কোনো ধরা বাধা নিয়ম নেই।

হ্যাঁ তা নেই।

অতএব বুঝতেই পারছেন, আপনাকে আমার ভালো লাগেনি।

কারনটা জানতে পারি?

সোহানের কারণ জানার কথাটা যেন রুমানার কাছে আশা হত যোদ্ধার করুণ আকুতির মতো মনে হলো। সোহানের দিকে তাকাতে দেখল, পুরুষ মানুষ হয়েও কেমন ছলছল চোখে ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর মুখ দিয়ে যদি আর একটা ওর ব্যক্তিত্বের প্রতি অপমান জনক কথা বেরিয়ে আসে তাহলেই পানিতে টলমল ওই দু'নয়নের দু'কূল ছাপিয়ে বন্যা নেমে আসবে। ওর বুঝতে এও বাকি নেই যে সোহান ওকে সত্যি সত্যি ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু সোহান সাহেবের ভালোবাসার ডাকে সাড়া দেওয়ার সাহস বা যোগ্যতা কোনোটাই তো ওর নেই। সবচেয়ে বড় কথা একটা মেয়ে যে জিনিসের জন্য নিজের কাছে, সমাজের কাছে মাথা উঁচু করে চলতে পারে, বলতে পারে সেই মহামূল্যবান সম্পদটা তো ও আগেই হারিয়ে ফেলেছে। হায়নাদের কাছে লুট হয়ে গেছে ওর সাজানো স্বপ্নের বাসর। আজ শুধু পড়ে আছে বাশি ফুলের কটা পাপড়ি। যা অনাদরে অবহেলায় শুকিয়ে শুকনো পাতার মতো মরমড়ে হয়ে গেছে। একে ধরলে, যত্ন করলে স্বাভাবিকতা তো কখনো আসবেই না বরং ধরতে গেলে রোদে পোড়া শুকনো পাতার মতো গুড়ো হয়ে যাবে। তারপরও ওয়ো তো মানুষ। এখন তো ওর স্বপ্ন দেখার কথা। কী এমন বয়সিইবা হয়েছে ওর। অথচ এই বয়সেই ওর জীবনের স্বপ্ন দেখা শেষ। ছল চাতুরির প্যাঁচে ফেলে প্রতারক হায়নার দল, ওর সব কিছু

দলে মুচড়ে শেষ করে দিয়েছে। নিয়ে গেছে যা ছিল ওর সবকিছু। এসব ভাবতে ভাবতে ওর কচি মনটার ভিতর কষ্টের পাহাড়টায় যেন ভূমি কম্পের মতো মোচড় দিল।

অনেকক্ষণ রুমানাকে কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে সোহান আবার বলল, আমার প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু এখন পর্যন্ত পেলাম না।

সোহানের কথায় বাস্তবে ফিরে রুমানা বলল, কোনটা?

আমাকে তোমার অপছন্দের কারনটা।

নড়েচড়ে বসে রুমানা বলল, দেখুন সোহান সাহেব আপনি আমাকে নিয়ে যা ভাবছেন আসলে বাস্তবে তা আপনার পক্ষে যেমন সম্ভব না তেমনি আমার পক্ষেও সম্ভব না।

কেন সম্ভব ন?

এই ধরুন আপনি হলেন বড়লোক মা-বাবার সন্তান। আপনার পরিবার, আপনার সমাজ কোনোটাতেই আমি মানানসই নই। কারণ, আমি খুবই সাধারণ একটা মেয়ে। আপনার চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে আমার চাওয়া পাওয়ার তফাত এতটা যতটা তফাত আসমান আর জমিনের মধ্যে। আপনি ইচ্ছা করলেই অনেক কিছু করতে পারেন আর আমি করা তো দূরের কথা তা চিন্তাও করতে পারি না। সবচেয়ে বড় কথা...।

রুমানাকে থামিয়ে দিয়ে সোহান বলল, দেখ, তোমার কোনো কথাতেই তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

কিসের জোরে আপনি কথাটা বলছেন?

আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার ভালোবাসার জোরে বলছি।

দেখুন, আপনার ভালোবাসার জোর কতটা যানি না। তবে আপনি আমার আসল পরিচয় জানলে শুধু অবাকই হবেন না। সেই সঙ্গে আমার প্রতি আপনার যে পরিমাণ ভালোবাসা জন্মেছে আমার বিশ্বাস তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ঘৃণা জন্মাবে। সেই সঙ্গে নিজের প্রতিও আপনার ঘৃণা জন্মাবে এই ভেবে যে, আমার মত একটা মেয়েকে আপনার ভালো লেগেছিল।

আমি কি তোমার পরিচয় দেখে তোমাকে ভালোবেসেছি? না কি আমি তোমার পরিচয়কে বিয়ে করতে চেয়েছি?

দেখুন আপনি এখন যা বলছেন তা হলো আপনার ভালোবাসার আবেগের কথা। যখন এই আবেগের মোহকেটে গিয়ে আপনি আমি চরম বাস্তবের সামনে এসে দাঁড়াব তখন কিন্তু এই আপনি আর আপনি থাকবেন না। থাকতে পারবেন না।

তুমি কি আমার ভালোবাসাকে চ্যালেঞ্জ করছ?

অসম্ভব। তা করার মত সাহস বা যোগ্যতা কোনোটাই আমার নেই। আমি শুধু আমদের প্রকৃত অবস্থার কথা বোঝাবার জন্যই কথাটা বলেছি।

ঠিক আছে তুমি আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও।

বলুন কি জানতে চান? বলার মত হলে অবশ্যই উত্তর দেব।

তুমি কি আমাকে মানে আমার ভালোবাসাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

অবশ্যই পারছি।

তুমি বুকে হাত দিয়ে বলতো আমি কি তোমার মনে এক বিন্দুও স্থান করে নিতে পারিনি?

এক বিন্দু না, আপনি আমার মনের পুরোটাই দখল করে নিয়েছেন। কিন্ত...।

রুমানাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে সোহান আবার বলল, দেখ তোমার কাছ থেকে যা জানার ছিল আমার তা জানা হয়ে গেছে। আমি এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আর কথা বলতে চাই না। আমার গার্জেনরা আমার বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছেন। আমি তাঁদের কাছে সরাসরি তোমার কথা বলব। তাঁরা তোমার বর্তমান মা বাবার সঙ্গে কথা বলে সব কিছু ফাইন্যাল করবেন। এটা শুধু আমার কথার কথা না। আমার ভালোবাসার বিশ্বাস। আমি এও বিশ্বাস রাখি যে, আমার গার্জেনরা তোমার মা-বাবার কাছে প্রস্তাব নিয়ে গেলে তুমি হাবিজাবি আগপিছ না ভেবে নিজের সম্মতি জানাবে।

সোহান থামতে রুমানা বলল, দেখুন আপনি কিন্তু নিজের জীবনে বিরাট একটা ভুল করতে যাচ্ছেন। বিয়েশাদী পুতুল খেলা নয়। যে মন চাইল বিয়ে করলাম আবার মন চাইল না ভেঙে ফেললাম। এটা দুটো মানুষের সারা জীবনের ব্যাপার। আমি বলব, আমার সব কথা, আমার সব কিছু শুধু আপনার শুনাই দরকার না জানাও দরকার। আমি বলি কী আপনি বরং আপনার সমাজ থেকে একটা সুন্দর মেয়েকে নিজের জীবনসঙ্গি হিসেবে বেছেনিন। এতে যেমন আপনি সুখি হবেন তেমনি আমিও শান্তি পাব।

দেখ, তুমি কিন্তু আমাকে ইনসাল্ট করছ। আমি প্রথমেই বলেছি আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি ভেব না, তুমি ছাড়া আমি এ জীবনে আর কোনো মেয়ের সাথে পরিচিত হইনি। আমার সঙ্গে দেশে এবং বিদেশে অনেক মেয়েই বন্ধুত্ব করেছে, অনেকে আবার সেই বন্ধুত্বের সিঁড়ি বেয়ে ভালোবাসার আহ্বান জানিয়েছে। তাদের কেউ আমার মনে জায়গা পাওয়া তো দূরের কথা

একটা রেখাপাত পর্যন্ত করতে পারেনি। অতএব বুঝতেই পারছ, আমি কেমন ছেলে?

কিন্তু...।

আর কোনো কিন্তু নয়। আমি যা বললাম সে অনুযায়ী কাজ করবে। কথা শেষ করে বলল, কথায় কথায় অনেক সময় চলে গেছে, এখন নাস্তাটা দ্রুত শেষ করে চল তোমাকে তোমাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

রাতে ডাইনিংয়ে আলী আহম্মেদ চৌধুরী, ইয়াসমিন ইলেন বেগম ও সোহান পাশাপাশি বসে খাচ্ছে। খেতে খেতে ইলেন বেগম সোহানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কিরে সেদিন না বললি, একটা মেয়ের ব্যাপারে কি যেন বলবি?

সোহান মুখের ভাতগুলো চিবোতে চিবোতে বলল, হ্যাঁ বলেছিলাম।

ইলেন বেগম আবার বললেন, তা বল তোর কি কোনো মেয়ে পছন্দ আছে?

জি আছে।

আলী আহম্মেদ সাহেব মুখে খুশি ভাব ফুটিয়ে বললেন, তা মেয়েটা কে? কার মেয়ে? বাসা কোথায়?

ইলেন বেগম বিরক্তির সঙ্গে বললেন, থামো তো তুমি। ওকেই বলতে দাও। তারপর সোহানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এক এক করে তোর বাবার প্রশ্নের উত্তরগুলো দেতো বাবা।

সোহান একবার মা বাবার উপর দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে পুনরায় বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার বন্ধু আমিনুলের বোন মানে তোমার বন্ধু আনিস আংকেলের মেয়ে রুমানা।

ছেলের মুখে মেয়েটার পরিচয় দেওয়ার ধরণ দেখে ইলেন বেগম যতটা না অবাক হলেন তার চেয়ে বেশি অবাক হলেন, ছেলের রুচি দেখে। নিজেকে সামনে নিয়ে বললেন, আনিস সাহেবের আসল পরিচয় তুই জানিস?

তার মানে! অবাক হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে সোহান বলল।

তার মানে আবার কি? প্রতি উত্তরে ইলেন বেগম বললেন।

আমি তো যানি, আনিস আংকেল ও বাবা উভয়েই বাল্যবন্ধু। একসঙ্গে বড় হয়েছেন, পড়াশোনা করেছেন এবং একসঙ্গে বাবার ব্যবসা দেখা শুনা করছেন।

ছেলের কথার প্রতিবাদ করে ইলেন বেগম বললেন, এতো দিন তুই যা দেখে এসেছিস, শুনে এসেছিস তা ঠিক না, সত্য না। যা সত্য তা হলো, আনিস সাহেব তোর বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারি মাত্র। আর তুই ভাবলি কিভাবে, একজন কর্মচারির মেয়েকে আমরা আমাদের একমাত্র পুত্র বধূ করে এ বাড়িতে আনব?

তারপর তাচ্ছিলের সঙ্গে আবার বললেন, তাও যদি মেয়েটা আনিসের নিজের মেয়ে হত। ওতো আনিসের ঘরে আশ্রিতা। শুনেছিলাম, আনিস ক'বছর আগে মেয়েটাকে কোথা থেকে যেন কুড়িয়ে পেয়ে নিজেদের কোনো মেয়ে নেই বলে নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছে। তারপরও কি তুই বলবি, জীবন সঙ্গি হিসেবে ওই মেয়েটাই তোর পছন্দ? একনিশ্বাসে কথাগুলো বলে রাগে থরথর করে কাপতে লাগলেন ইলেন বেগম।

ইলেন বেগম কথা শেষ করার পর বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। উপস্থিত কেউ কোনো কথা বলল না। নিরবতা ভঙ্গ করে আলী আহম্মেদ চৌধুরী ছেলে সোহানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মেয়েটার ব্যাপারে এসব কিছু জানতিস?

না।

তার মানে, মেয়েটা তোর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আলী আহম্মেদ চৌধুরী তার স্বভাবসুলভ শান্ত ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন।

সোহন মৃদু প্রতিবাদ করে বলল, কিন্তু বাবা, আমার ওকে পছন্দ হয়েছে। বিয়ে তো আমি ওকে করব, ওর পরিচয়কে না। তাছাড়া আমাকে তো ওর পরিচয়ে চলতে হবে এমন নয়।

ইলেন বেগম উচ্চ স্বরে বলে উঠলেন, তুই থামলি? তুই একবার ভেবে দেখেছিস, ওকে বিয়ে করলে তুই আমাদের সোসাইটিতে ওকে নিয়ে কারো সামনে দাঁড়াতে পারবি?

বিস্ময় ভরা কণ্ঠে সোহান বলল, আমি কেন সবার সামনে ওকে নিয়ে দাঁড়াতে যাব! আমাদের কি কোনো কিছুর অভাব আছে? তাছাড়া আমার তো মনে হচ্ছে, তোমরা শিক্ষিত হলেও আজও সেই মধ্যযুগেই রয়ে গেছ। পৃথিবী এখন কত এগিয়ে গেছে। মানুষ পৃথিবী থেকে চাঁদে গেছে। চাঁদ থেকে মঙ্গলে যাওয়ার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে প্রার্থ ফাইন্ডার পর্যন্ত মঙ্গলের বুকে অবতরণ

করিয়ে সেখানে মানুষের আগমণ বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছে। অথচ এই সময়ের শিক্ষিত মা বাবা হয়ে তোমরা সেই মধ্যযুগের মা বাবাদের মতো ধ্যান ধারণা পোষণ করে আজো বসে আছ।

ছেলের কথা শুনে ইলেন বেগম বিস্ময় ভরা চোখে স্বামী আলী আহম্মেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শুনেছ তোমার গুণধর ছেলের কথা! ওকে জিজ্ঞেস কর, ওকি রূপকথার রাজ্যে বাস করে না পৃথিবীতে বাস করে?

মা ইলেন বেগম কথা শেষ করতে সোহান আবার বলল, মা তুমি অযথাই রাগ করছ। একটু বুঝার চেষ্টা কর। আমি তোমার অবুঝ ছেলে নই যে, একটা মেয়ে আমাকে তার রূপ দেখিয়ে সহজেই পটিয়ে ফেলেছে। আমাকে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় এমনি এমনি উচ্চ শিক্ষায় ডিগ্রী দেয়নি। আমি আমার যোগ্যতা দিয়েই আমেরিকার মতো দেশ থেকে উচ্চ শিক্ষায় ডিগ্রী নিয়ে এসেছি। এমনও নয় যে আমি জীবনে রুমানা ছাড়া আর কোনো মেয়ের সাথে পরিচিত হই নি বা উঠা বসা করিনি। দেশে এবং বিদেশে উভয় জায়গাতেই একাধিক মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, বন্ধুত্ব হয়েছে। আমি দেখেছি, দেশের মেয়েরা আমার থেকে আমাদের ধনসম্পত্তিকেই বেশি ভালোবেসেছে। আর বিদেশে, ওখানকার মেয়েরা মানুষের থেকে ধন সম্পত্তির সঙ্গে অবৈধ যৌনতাকেই বেশি পছন্দ করে। তাছাড়া রুমানা আমাকে আবিষ্কার করে নি। আমি ওকে আবিষ্কার করেছি। তোমরা শুনে আরো অবাক হবে যে, আমি শত চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত রুমানার মনে জায়গা করে নিতে পারিনি। ওর ভিতর আমি সরলতা ছাড়া কোনো লোভ লালসা দেখিনি। আমি দেশে এবং বিদেশে অনেক মেয়েই দেখেছি কিন্তু ওর মতো সহজ সরল এবং শান্তশিষ্ট আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। আর এ পর্যন্ত ও ছাড়া আর কোনো মেয়ে আমার মনে স্থান পাওয়া তো দূরের কথা রেখাপাত পর্যন্ত করতে পারবে নি। আমার বিশ্বাস রুমানা শুধু আমাকেই সুখি করতে পারবে না, তোমাদেরকেও সুখি করতে পারবে। ওর ভিতর সেই এনার্জী ও যোগ্যতা উভয়ই আছে।

সোহান কথা শেষ করতে আলী আহম্মেদ সাহেব বললেন, ঠিক আছে তুমি এখন যাও। আমরা বিষয়টা ভেবে চিন্তে তোমাকে জানাব।

অনুমতি পেয়ে সোহান নিজের ঘরে চলে যাওয়ার পর আলী আহম্মেদ চৌধুরী স্ত্রীকে শান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি চিন্তা কর না। কাল বিষয়টা নিয়ে আনিসুলের সাথে আলাপ করে দেখি এর ভিতর আসল ঘটনাটা কী।

ইলেন বেগম কাঁদো কাঁদো অবস্থায় স্বামীকে বললেন, তুমি আনিস

ভাইকে বলবে, সে যেন যেভাবেই হোক মেয়েটাকে তার বাসা থেকে বিদায় করে। তা না হলে কিন্তু আমি কখনই তাকে ক্ষমা করব না। মেয়েটা আমার সহজ সরল ছেলেটাকে রূপের কাঁদে ফেলে ফাঁসাতে চাচ্ছে।

আবারও শান্ত্বনা দিয়ে আলী আহম্মেদ সাহেব বললেন, ঠিক আছে, তুমি চিন্তা কর না আমি সব বুঝিয়ে বলে এর একটা সমাধান বের করে আনব।

পরদিন অফিসে ঢুকেই আলী আহম্মেদ চৌধুরী পিয়নকে দিয়ে আনিসুল সাহেবকে নিজের রুমে ডেকে পাঠালেন।

চৌধুরী গ্রুপের চেয়ারম্যান আলী আহম্মেদ চৌধুরী ও এমডি আনিসুল হক সাহেব বাল্যবন্ধু হলেও অফিসে একে অপরকে অফিসিয়াল নিয়মেই সম্বধন করেন। যতক্ষণ অফিসে থাকেন কখনই উভয়ের কেউই অফিসিয়াল নিয়মের বাইরে যান না।

পিয়ন বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর আনিসুল হক রুমের দরজা খুলে বলল, স্যার আসতে পারি?

আলী আহম্মেদ চৌধুরী নিজের টেবিলের সামনে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে বললেন, আনিসুল, এখন আমি তোর সঙ্গে আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ করব। তুই যেন আবার তোর অফিসিয়াল নিয়ম ফলাতে যাস না।

আনিসুল হক সাহেব বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে বললেন, ক্যান কি হইছে!

তোর উতলা হওয়ার কিছু নেই, তুই শান্ত হয়ে বোস। আর আমি যা যা জিজ্ঞেস করি তার উত্তর দে।

আজ হঠাৎ কী এমন হলো যে, আলী আহম্মেদ অফিসের ভিতর নিজের রুমে হঠাৎ ওকে ডেকে কি এমন কথা জানতে চাচ্ছে তা বুঝতে না পেরে আনিসুল হক সাহেব ভীতরে ভীতরে তা জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। আলী আহম্মেদের দিকে তাকাতে লক্ষ করলেন, আজ সেও যেন কেমন চিন্তাগ্রস্থ। আসল ব্যাপারটা জানার জন্য আর থাকতে না পেরে বললেন, আসল ব্যাপারটা কি খুইলা ক তো?

আলী আহম্মেদ চৌধুরী নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললেন, তোর বাসায় রুমানা নামে একটা মেয়ে থাকে না?

হ থাকে। তারপর আবার বললেন, ক্যান কি হইছে? রুমানার ব্যাপারে আইজ হঠাৎ তুই জানবার চাইতাছস ক্যান?

তুই খুলে বল তো মেয়েটা কি তোদের কোনো রিলেটিভ না কি পূর্বে যা

শুনেছিলাম তাই?

তার আগে তুই খুইলা ক তো কি হইছে? আইজ হঠাৎ তুই ওর ব্যাপারে জানতেই বা এতো আগ্রহী ক্যান?

তোর ভাতিজা মানে আমার ছেলে সোহান ওই মেয়েটাকে নিজের জীবনসঙ্গি করে ঘরে তুলতে চায়। এখন তুই কী বলিস বল। ছেলের মুখে শুনে তোর ভাবি কিন্তু একেবারে তেলেবেগুনে খেপে আছে তোর উপর। আমাকে বলেছে, আমি যেন তার হয়ে তোকে বলি, যেভাবেই হোক মেয়েটাকে তোর ঘর থেকে বিদায় করতে। তা না হলে তোর ভাবি তোকে কখনোই ক্ষমা করবে না।

বন্ধুর মুখে রুমানার ব্যাপারে কথাগুলো শুনে আনিসুল হক সাহেব নিজেকে নিজে বিশ্বাস করতে পারছেন না। রুমানা তার আশ্রয়ে আজ প্রায় চার বছর আছে। কিন্তু কখনো তার নিজের চোখে বা বাসার অন্য কারো চোখে মেয়েটার ভালো দিক ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়েনি। কিন্তু এখন বন্ধুর মুখে সবশুনে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, কিন্তু আমি ভাইবা পাইতাছিনা, সোহান বাবাজির সঙ্গে রুমানার সম্পর্ক তো দূরের কথা পরিচয় হইল কি কইরা?

সেটা এখন আর আমাদের জানার দরকার নেই। যেভাবেই হোক ছেলের কথা শুনে বুঝলাম, ওদের মধ্যে একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আর এটাকে আমি সে রকম অন্যায় কিছু মনেও করছি না। আমি জানতে চাচ্ছি, তুই মেয়েটা সম্পর্কে কতটুকু কি জানিস?

দেখ যেইটা সত্য কথা তা হইল মাইয়াটা সম্পর্কে আইজ পর্যন্ত আমি তেমন কিছুই জানতে পারি নাই। আমার গাড়ির ড্রাইভার মবিন একদিন আমার কাছে মাইয়াটারে নিয়া আইসা কইল-তারপর আনিসুল সাহেব পূর্বের ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে আবার বললেন, তারপর তোর ভাবি, মাইয়াটারে দেইখা তার মায়া হইতে নিজের কাছেই রাইখা দেয়। তুই তো জানস, ওর একটা মাইয়ার খুব শখ ছিল। কিন্তু ফরিদুল হওয়োনের পর যহন টাইফয়েডে পড়ল তহন ডাক্তার সাহেব কইছিলেন, যে ও আর মা হইতে পারব না। তাই মাইয়াটারে পাইয়া শেষে ওর ভিতরেই নিজের মাইয়ারে খুঁইজা লইছে। তোর ভাবির দিক দিয়া পরে কোনো চাপ না আহনে পরবর্তীতে আমি নিজেও আর মাইয়াটার আসল পরিচয় সম্বন্ধে খোঁজ খবর লওয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নাই। তোর মুখে এখন যা হুনলাম এবং রুমানার ব্যাপারে ভাবির যে

মনোভাবের কথা কইলি তাতে কইরা তো দেখতাছি অবস্থা খুব গুরুতর।

হ্যাঁ তাই।

তাইলে তুই আমারে এ অবস্থায় কি করতে কস?

মেয়েটা তোর আশ্রয়ে আজ কত বছর হলো আছে?

তা প্রায় চার পাঁচ বছর তো হইবই।

মবিন যেদিন মেয়েটাকে তোর বাসায় নিয়ে আসল তখন কি মেয়েটার কাছে ওর নিজের পরিচয়, থাকত কোথায়, বাড়ি কোথায় এসব কিছু জিজ্ঞেস করেছিলি?

করছিলাম। কিন্তু মাইয়াটা হেই সময় কোনো কিছুর সদুত্তর দেয় নাই। শুধু কইছিল পরে তোর ভাবির কাছে সব কইব।

পরে কি ভাবির কাছে বলেছে কি না ভাবিকে জিজ্ঞেস করেছিলি?

না। পর মুহূর্তে আবার বললেন, হা, হা একবার জিজ্ঞাস করছিলাম। তোর ভাবি কইছেল, ওগো দেশের বাড়ি বরিশাল জেলায়। কোন একটা নদীর পাড়ে নাকি ওগো বাড়ি। ওর মা বাবা খুবই গরিব।

মেয়েটা পড়াশোনা কিছু জানে?

পড়ালেহা জানে মানে! ওয় খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট।

তাই! বিস্ময় ভরা চোখে আলী আহম্মেদ চৌধুরী বললেন।

তয় আর কইতাছি কী। এইবার ওয় ইন্টার পরীক্ষা দিবো।

ঠিক আছে আজ এ পর্যন্তই থাক। তারপর আলী আহম্মেদ সাহেব আবার বললেন, ভাবিকে বলিস শিগ্‌গির আমরা তোদের বাসায় আসব। ভাবির হাতের শর্ষে ইলিশ অনেকদিন খাওয়া হয়নি।

কথা শুনে হেসে ফেলে আনিসুল হক সাহেব বললেন, কবে আবি ক, আমি সব ব্যবস্থা কইরা রাখুম।

অতো ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। তুই তো আর দূরের কেউ না বা আমার কাছ থেকে অনেক দূরেও থাকিস না। যাওয়ার আগে তোকে জানিয়েই যাব।

ঠিক আছে, তাইলে ওই কথাই রইল। কথা শেষ করে আনিসুল হক সাহেব আলী আহম্মেদ চৌধুরীর রুম থেকে বেরিয়ে নিজের রুমে চলে গেলেন।

আনিসুল হক সাহেবকে উৎফুল্ল মনে বাসায় ফিরতে দেখে স্ত্রী সুরাইয়া বেগম স্বামীর শরীর থেকে কাপড় খুলে নিতে নিতে বললেন, ব্যাপার কি? আজ যে দেখছি মনে আনন্দ ধরে না। বুড়ো বয়সে আবার ভিমরতিতে ধরেনি তো?

ভিমরতিতে ধরছে ঠিকিই, তবে আমারে না।

অবাক দৃষ্টিতে সুরাইয়া বেগম বললেন, কাকে?

তোমার ভাই।

মানে! কোন ভাইরে? আমি তো তোমার কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

সব হুনলে তুমিও ভিরমি খাইবা।

কপট রাগের সঙ্গে সুরাইয়া বেগম বললেন, হেয়ালিপনা রেখে আসল কথাটা বল তো। আমার কিন্তু রাগ হচ্ছে।

লুঙ্গিটা পরে নিয়ে ঘাটে আরাম করে বসে স্ত্রী সুরাইয়া বেগমকে পাশে বসিয়ে আনিসুল সাহেব বললেন, তাহলে হুন, তোমার ভাই মানে আমার বস আলী আহম্মেদ...।

বুঝলাম আলী আহম্মেদ ভাই। তা হয়েছেটা কি সেটা বলবে তো?

আরে বাবা কইতাছি, অতো অস্থির হইতাছ ক্যান? আলী আহম্মেদ ওর ছেলের লাইগা মাইয়া খুঁজতাছে।

তা তো ঠিকই, ছেলে উপযুক্ত হয়েছে তার উপর বিদেশ থেকে পড়াশোনা শেষ করে উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে এসেছে। এমন উপযুক্ত ছেলের জন্য মেয়ে তো খুঁজবেই। তবে আমি অবাক হচ্ছি, আলী ভাই তার ছেলের জন্য মেয়ে খুঁজছে আর এদিকে তুমি আনন্দে নাচ্ছ। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

স্ত্রীর কথা শুনে হেসে ফেলে আনিসুল হক সাহেব বললেন, আমি আনন্দিত হমু না তো তুমি হইবা? আরে বোকা, এদিক দিয়া ঘটনা তো আর একটা ঘইটা গেছে। ওর পোলা সোহান ক্যামনে জানি আমাগো রুমানারে দেখছে, ওই দেখাতেই রুমানা ওর মনে ধইরা গেছে। বাপ মায়েরে কইছে, বিয়া যদি করতেই হয় তয় রুমানারেই করুম।

সব শুনে সুরাইয়া বেগমের খুশি হওয়াতো দূরের কথা অবাক বিস্ময়ে বললেন, বল কি!

স্ত্রীকে অবাক হতে দেখে আনিসুল হক সাহেব আবার বললেন, কি ব্যাপার কথাটা হুইনা খুশি না হইয়া তুমি দেখতাছি সত্যি সত্যি ভিরমি খাইলা।

কথাটা ভিরমি খাওয়ার মতই।

বুঝলাম না।

তার আগে বল, ছেলের মুখে ওই কথা শুনে আলী ভাই ও ভাবি কি বলেছে?

আলীর কথা হুইনা তো মনে হইল ওয় ছেলের ইচ্ছায় রাজি।

আর ভাবি?

কইল, সব হুইনা ভাবি নাকি, খুব রাগ করছে সোহানরে। শেষমেষ আলী যা কইল তা হইল ওরা খুব শিগ্‌গির আমাগো বাসায় আইব কথাটা তোমারে জানাইতে কইছে আরো কইছে আইলে তোমার হাতের শর্ষা ইলিশ খায়া তয় যাইব।

সেটা কোনো ব্যাপার না কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।

তুমি আবার কি ভাবতাছ? ওরা যদি আমার মাইয়ারে দেখতে চায় দেখব। পছন্দ হইলে নিব না পছন্দ হইলে নিব না। আমি তো আমার মাইয়ার আসল পরিচয় ওর কাছে গোপন করি নাই। যা সত্য তাই কইছি।

ছোট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরাইয়া বেগম বললেন, তোমার সত্যর ভিতরে আরো সত্য আছে।

বুঝলাম না। খোলাশা কইরা কও।

রুমানার সম্পর্কে তুমি যে সত্য জান সেটাই শেষ না। তারপর আরো আছে।

স্ত্রীর কথা শুনে আগামাথা বুঝতে না পেরে আনিসুল হক সাহেব আবার বললেন, আমি তো তোমার কথার কিছুই বুঝতে পারতাছি না। আমি যা জানি তুমি হের পরও কি জান শুনি?

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরাইয়া বেগম বললেন, আমি মা হয়ে মেয়ের জীবনের সেই দুঃসহ কষ্টের কথা তোমাকে বলতে পারব না। শুধু এতটুকু জেনে রাখ, মেয়েটা আমার আগুনে পুড়া কয়লা। আমি ওর ভবিষ্যৎ সুখের হোক চাই। তাই বলে সন্দেহ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি ওকে কারো হাতে তুলে দিব না।

স্ত্রীর কথার অর্থ এবারও বুঝতে না পেরে আনিসুল হক সাহেব আবারও বললেন, আমি তোমার এসব কথার কিছুই বুঝতে পারতাছি না। আসলে ঘটনাটা কি খুইলা কও তো?

তুমিও তো পুরুষ। ওসব তুমি বুঝবে না। ওরা আসুক তখনই আমি সবার সামনে কথাগুলো বলব। সব শুনে ওরা যদি রাজি থাকে তবেই আমি সোহানের হাতে মেয়েকে তুলে দিব অন্যথায় না। কথা শেষ করে সুরাইয়া বেগম নিজের কাজে চলে গেলেন।

সুরাইয়া বেগম ও আনিসুল হক সাহেব যখন কথা বলছিলেন তখন কী একটা প্রয়োজনে ওদের ঘরে ঢুকতে গিয়ে যখন শুনল ভিতরে দু'জনে ওর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে তখন রুমানা ভিতরে আর না ঢুকে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ওঁদের দু'জনের সমস্ত কথা শুনে শিউরে উঠল। ওর প্রতি সুরাইয়া বেগম ও আনিসুল হক সাহেবের ভালোবাসা ও দ্বায়িত্ববোধ দেখে কৃতজ্ঞতায় দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা বেরিয়ে আসল। মনে মনে সৃষ্টি কর্তা আল্লাহর শুকরিয়া জানিয়ে বলল, "তোমার দুনিয়ায় যে আজও ভালো মানুষ আছে এরা তার প্রমাণ। তুমি এদের সর্বসময় মঙ্গল কর।" তারপর সুরাইয়া বেগমকে বেরিয়ে আসতে দেখে দ্রুত দরজার পাশ থেকে সরে নিজের ঘরে চলে গেল। দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ে বুক ফাটা আর্তনাদে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলতে লাগল, "তুমি তো এই বিশ্ব ভ্রমাণ্ডের মালিক। তোমার ক্ষমতা অসীম। তুমি যেমন তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য এই পৃথিবী, সৌরজগত, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি তৈরি করেছ এবং এগুলোকে আবার তোমারই সৃষ্টি মানুষের উপকারের জন্য ব্যবহারও করাচ্ছ। তুমি এক কথায় সর্ব শক্তিমান। যা ইচ্ছা তাই করতে পার। তাই তোমার কাছে আমার অনুরোধ, আমি এ পৃথিবীতে, এই সমাজে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে চাই। তুমি আমার এই ইচ্ছাটা পূর্ণ কর। তুমি আমার একটা ভুলের জন্য আমার এই জীবনে যে শাস্তি দিয়েছে তার জন্য কোনো প্রতিবাদ করব না শুধু বলব, আমি আর পারছি না আমাকে মুক্তি দাও। আমার ভবিষ্যৎ জীবন যা করলে ভালো হবে, যে ভাবে চললে তুমি রাজি ও খুশি হবে আমাকে তুমি সেভাবে চালাও। আমি অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে তোমার রহমতের ছাঁয়ায় আশ্রয় দাও। আমি তোমার কাছে নিরাপদ আশ্রয় চাই। আমি জানি না সোহান সাহেব মানুষ হিসেবে কেমন। সে আমার ভিতর কী দেখে আমার প্রতি আকর্ষিত হয়েছে তাও আমি জানি না। কিন্তু আমি তাকে ঠকাতে পারব না। এ ব্যাপারে আমি কী করব তুমি আমার মনে তার

জানান দাও। তুমি যদি সোহান সাহেবের কাছে আমার ভবিষ্যৎ আশ্রয় লিখে রাখ তাও জানান দাও না রাখলেও জানান দাও।"

পর মুহূর্তে স্মৃতির পাতায় ওর মা-বাবা, ছোট ভাইয়েদের মলিন মুখগুলো ভেসে উঠতে আরো জোরে ফুলে ফুলে উঠে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আজ কতগুলো বছর হলো মানুষগুলোকে দেখি না। ওদের কোনো খোঁজ খবরও জানি না। বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও জানি না। শুধামাত্র ছোট ছোট ভাইয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে তাকিয়ে শত কষ্ট সহ্য করে নিজেকে ওদের কাছ থেকে শুধু দূরেই সরিয়ে রাখিনি আমার কোনো খোঁজ খবরও ওদেরকে জানাইনি। আর কখনো জানাতেও চাই না। ছোট ছোট ভাইগুলো এতোদিনে হয়তো অনেক বড় হয়ে গেছে। আমার কথা হয়তোবা ভুলেও গেছে। আমার মুখচ্ছবি হয়তো ওদের স্মৃতির এ্যালবাম থেকে হারিয়েও গেছে। আমিও তাই চাই। আমার জন্য ওদের ভবিষ্যৎ জীবনের যে ক্ষতি হয়েছে আমি নিজের জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে যাব। তবু ওরা ভালো থাকুক এটাই আমার কাম্য। এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে আর কাঁদতে কাঁদতে কখন যে কষ্টের মরুভূমিতে দু'চোখের পাতায় নিদ্রা এসে ওকে নিয়ে হারিয়ে গেছে ঘুম রাজ্যে রুমানা বুঝতেও পারেনি।

আজ দিনটার শুরু দেখেই রুমানার মনটা ভরে গেল। আজ অনেকদিন পর পাখির কালকাকুলিতে ওর ঘুম ভাঙল। চোখ খুলে দেয়ালে টানান ঘড়িটার দিকে তাকাতে দেখল ছটা আঠারো বাজে। বিছানায় শুয়েই দক্ষিণ পাশের বাগানের দিকের জানালার গ্লাসের ভিতর দিয়ে দেখতে পেল বাইরে সবে আস্তে আস্তে দিনের মিষ্টি আলোর ছটা পড়তে শুরু করেছে। সকালের সেই মিষ্টি আলোয় বাগানের দেবদারু গাছগুলোতে একঝাক ছোট ছোট পাখি কলকাকুলিতে মেতে উঠেছে।

এই সকালের সৌন্দর্য সুধা গ্রহণের তাগিদে উঠে গিয়ে জানালার পাশের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ওর ঘরের বারান্দা থেকে আশপাশের অনেকটা দূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। আকাশের পানে তাকাতে দেখল শীতের সকালের আকাশে মেঘেদের মাঝ দিয়ে সূর্য উঁকিঝুঁকি মারছে। শীতের মিষ্টি সূর্যের আলো ওর শরীরে এসে পড়তে শরীরের মাঝে এক রকম প্রশান্তির পুলক

অনুভব করল। ওর কাছে মনে হলো ওর যেন কোনো দুঃখ নেই, কোনো কষ্ট নেই। কখনো ছিল কিনা তাও মনে আসছে না। আজ ওর নিজের ভিতর ও যেন অন্য এক রুমানাকে দেখছে। যে রুমানা ওর জানা সেই রুমানা নয়। এই রুমানার অতীত কোনো গ্লানি নেই আছে সুন্দর বর্তমান আর স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ। তাই স্বপ্নের ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিল। যেভাবেই হোক আজ সোহান সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিতে হবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ভেবে রাখল, বড় ভাই আমিনুলের কাছ থেকে সোহান সাহেবের তথ্য পাওয়া যাবে। যেভাবেই হোক তার কাছ থেকেই খোঁজটা নিয়ে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

নাস্তার টেবিলে নাস্তা খেতে খেতে বার কয়েক চেষ্টা করেও সফল হতে পারল না রুমানা। পর মুহূর্তে চিন্তা করল, নাস্তা শেষ করে ভাইয়ার নিজের ঘরে গেলে সেখানে এক কাপ চা হাতে করে নিয়ে গিয়ে চা টা ভাইয়ার হাতে দিয়ে বলবে, ... এমন সময় হঠাৎ আমিনুলকে নাস্তা শেষ করে উঠে নিজের ঘরের দিকে যেতে দেখে পরিকল্পনা মাফিক এক কাপ চা হাতে করে নিয়ে ড্রয়িংরুমের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠতে কী মনে করে রিসিভারটা তুলে বলল, হ্যালো, কে বলছেন? কাকে চাচ্ছেন প্লিজ?

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে প্রশান্তির ছাঁয়া মাখা কণ্ঠে ভেসে আসল, চাচ্ছিলাম আমিনুলকে।

কণ্ঠস্বরটা চিনতে এক মুহূর্ত সময় লাগল রুমানার। মনে হলো যেন আকাশের চাঁদ ওর হাতে এসে ধরা দিয়েছে। খুশিতে কয়েক ফোটা আনন্দ অশ্রু গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ভাইয়াকে চাইলে তো আপনি ভাইয়ার মোবাইলেই ফোন করতে পারেন।

তা তো অবশ্যই পারি।

তা হলে ল্যাণ্ড ফোনে ফোন করেন কেন?

তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য।

সোহানের মুখে কথাটা শুনে রুমানার ভিতর যেন একটা পুলক খেলে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আমি একটা রাস্তার মেয়ে। আমার সাথে আপনার মত উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ ফ্যামিলির ছেলের কোনো কথা থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

তুমি কি আজ আমার সাথে ঝগড়া করবে বলে আগেই মনস্থির করে রেখেছ? জিজ্ঞেস করবে না কেন এই সাত সকালে তোমাকে ফোন করলাম?

অপ্রত্যাশিতভাবে সোহানের ফোন পেয়ে রুমানা কিছুটা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিল। সোহানের কথায় বাস্তবে ফিরে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁ বলুন কেন ফোন করেছেন?

ছোট করে হেসে নিয়ে সোহান বলল, এই তো লক্ষী মেয়ের মতো কথা। তা হলে এবার শোন, গতকাল রাতে আমাদের বাসায় আমার মা-বাবা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আগামীকাল বিকেলে ওনারা ওদের একমাত্র ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে যাবেন।

কথাটা শুনে রুমানার বুকের মাঝে যেন একটা ধাক্কা লাগল। মুখ থেকে যেন কথা হারিয়ে গেল। চোখের নদীতে যেন বান আসার উপক্রম হলো। প্রতি উত্তরে কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ রুমানাকে চুপ হয়ে থাকতে দেখে সোহান তাগাদা দিয়ে বলল, কি ব্যাপার চুপ হয়ে গেলে যে? জানতে চাইবে না, কোথায় কোন মেয়েকে দেখতে যাবে?

ওটা জানার প্রয়োজন কি আছে?

অবশ্যই আছে।

আপনার কাছে হয় তো থাকতে পারে।

তোমার কাছে নেই?

না।

না! কারনটা জানতে পারি?

তার আগে বলুন ওরা কি আমাদের বাসায় আসছেন?

কেন, তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে?

দেখুন, এখানে সন্দেহ নিঃসন্দেহের ব্যাপারটার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনার এ পাগলামির ব্যাপারে আমার একটা সিদ্ধান্ত আছে।

বল, তোমার কি সিদ্ধান্ত?

এ মুহূর্তে ফোনে বলা সম্ভব না।

গুড। তাহলে তুমিই বল, কোথায় কখন আমাকে হাজির হতে হবে?

কয়েক মুহূর্ত সময় চিন্তা করে নিয়ে রুমানা বলল, আজ আমাদের কলেজে একটা অনুষ্ঠান আছে। ব্রেকের পর অনুষ্ঠানের জন্য ছুটি হয়ে যাবে। আপনি তিনটার সময় আমার কলেজ গেটে অপেক্ষা করবেন।

স্বপ্নের সোনার পাখির স্ব ইচ্ছায় উড়ে এসে ধরা দেয়ার কথা শুনে সোহান মনে মনে যতটা না খুশি হয়েছে তার চেয়ে ভয় কোনো অংশে কম পায়নি। নিজের অদৃষ্টের উদ্দেশ্যে আকাশ পানে তাকিয়ে মনে মনে বলল, "তোমাকে আগে থেকেই বলে রাখছি, ও আমার জন্য যে সংবাদই বয়ে নিয়ে আসুক না কেন আমি কিন্তু আমার সিদ্ধান্তেই অটল। জীবনে বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে রুমানাকেই করব, তা না হলে না। যেমন আছি সারাটা জীবন তেমনি থেকে যাব।"

ঘড়ির কাটা যখন দুটা পঁচিশের ঘরে তখন সোহান তৈরি হয়ে নিজের গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রিয়া মিলনের বাসনায় প্রিয়ার কথামত ওর কলেজের উদ্দেশ্যে। গাড়ি নিয়ে আসতে আসতে ভাবতে লাগল এতোদিন বার বার চেষ্টা করেও প্রিয়ার কাছাকাছি যেতে পারিনি অথচ আজ প্রিয়াই ওকে মিলনের আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু এর পিছনে ওর আসল উদ্দেশ্যটা কী জানতে পারলে আগে থেকে উত্তরগুলো গুছিয়ে নিতে সুবিধে হত।

গাড়ি নিয়ে মহাখালি ফ্লাই ওভার দিয়ে নেমে প্রধান মন্ত্রির কার্যালয় পার হয়ে সামনের ক্রসিংয়ে এসে ট্রাফিক সিগন্যালে পড়ল। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে বারো তোরা বছরের একটা ফুটফুটে মেয়ে হাতে এক তোড়া নানা রংয়ের গোলাপ নিয়ে সোহানের জানালার কাছে এসে ফুলগুলো বাড়িয়ে ধরে বলল, ভাইজান ভাবি জানের লাইগা ফুলগুলা নিয়া যান। এগুলা দেখলে ভাবি খুশি হইব।

মেয়েটার মুখে কথাটা শুনে তাকাতে দেখল, মেয়েটার হাতে দুনিয়ার সুন্দরতম ফুল গোলাপ থাকলেও ওর শরীরের অবস্থা এবং ওর পরনের কাপড়ের অবস্থা খুবই বেহাল। মেয়েটাকে দেখে সোহানের মনে কেন যেন মায়ার উদ্রেক হলো। মুখে হাসি টেনে বলল, আমার ভাগ্যে তোর ভাবি তো এখনো জুটেনি। ফুল নিয়ে আমি কি করব?

সোহানের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, তাইলে আপনের বাসায় বইন থাকলে হের লাইগা নেন।

হেসে ফেলে সোহান আবার বলল, সেই বোনও তো আমার নেই।

তাইলে আপনের বান্ধবি নাই? হের লাইগা নেন, টাটকা ফুল পাইলে খুব খুশি হইব। কথাটা বলে ফুলের তোড়াটা জানালা দিয়ে ভিতরে বাড়িয়ে ধরল।

খুশি হবে এটা তুই জানলি কি করে? কৌতূহল কণ্ঠে সোহান বলল।

মেয়েটা সোহানের এই কথার কোনো উত্তর না দিলেও ওর ভাব দেখে সোহানের বুঝতে বাকি রইল না যে, মেয়েটা কী বুঝাতে চাচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে ট্রাফিক সিগন্যাল উঠে যেতে পারে ভেবে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ওর হাতে দিয়ে ফুলের তোড়াটা যেই হাত দিয়ে ধরতে গেছে অমনি তোড়ার একটা ফুলের ডাটার একটা কাঁটা ওর আঙ্গুলে ফুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উহ্ বলে সতর্কতার সঙ্গে অন্য হাত দিয়ে তোড়াটা নিয়ে কাঁটা ফোটা আঙ্গুলটা দেখিয়ে মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, নারে মনে হচ্ছে তোর ফুল দেখে আমার বান্ধবি খুশি হবে না।

টাকাটা সোহানের হাত থেকে নিয়ে মেয়েটা বলল, ক্যান খুশি হইব না ক্যান?

কাটা ফোটা আঙ্গুলটা দেখিয়ে সোহান বলল, দেখছিস না, কিভাবে রক্ত ঝরছে?

আঙ্গুল দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়তে দেখে মেয়েটা বলল, আপনে ভয় পাইয়েন না। আমি কইতাছি দেখবেন, আপনার বান্ধবি আইজ আপনার লগে হাসি খুশি থাকব।

কথা শুনে মুখে হাসি ফুটিয়ে সোহানও বলল, ঠিক আছে, তোর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ফেরার পথে তোকে আরো পঞ্চাশ টাকা দেব। এমন সময় সিগন্যাল উঠে যেতে গাড়ি নিয়ে দ্রুত ছুটে চলল নিজের গন্তব্যে।

ট্রাফিক সিগন্যাল এবং রাস্তায় জ্যামের কারণে গন্তব্যে আসতে সোহানের দশ মিনিট দেরি হয়ে গেছে। গাড়ি কলেজের বাইরে এক জায়গায় পার্ক করে যেই কলেজের গেটের দিকে যাবে বলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে অমনি পাশে রুমানাকে মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল, সরি, মনে হচ্ছে দেরি করে ফেলেছি।

বেশি না, মাত্র দশ মিনিট।

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাটা রুমানা বললেও ওর মুখ দেখে সোহানের বুঝতে বাকি রইলনা যে, ভিতরে ভিতরে ও অস্থির হয়ে উঠেছিল। হাতের ফুলের তোড়াটা রুমানার দিকে বাড়িয়ে ধরে মুখে হাসির রেশ টেনে বলল, এটা গ্রহণ করলে মনে করব, তুমি আমাকে আমার দেরির জন্য ক্ষমা করেছ।

রুমানা একটা হাত বাড়িয়ে ফুলের তোড়াটা নিয়ে নিজের নাকের কাছে নিয়ে বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে বলল, ধন্যবাদ। পরমুহূর্তে আবার বলল, আর একটা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ কারনে যে, ফুলগুলো টাটকা এবং গন্ধও খুব সুন্দর।

প্রতি উত্তরে রুমানাকেও ধন্যবাদ দিয়ে সোহান বলল, কোনো জায়গায় একটু বসলে ভালো হত না?

কোথায় বসবেন?

কোনো রেস্টুরেন্টে?

আপনার যদি কোনো অসুবিধা না থাকে তাহলে আমি আশপাশে কোনো নিরিবিলি খোলা জায়গায় খোলা আকাশের নিচে বসতে চাচ্ছি।

না আমার কোনো অসুবিধা নেই। কথা শেষ করে গাড়ির সামনের বাম পাশের দরজা খুলে ধরে বলল, চলে এসো। রুমানা গাড়িতে উঠে বসতে সোহান বাইরে দিয়ে দরজাটা লাগিয়ে নিজে ড্রাইভিংসিটে উঠে বসে গাড়ি নিয়ে সোজা সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার দিকে চলে গেল। গাড়ি এক জায়গায় পার্ক করে রেখে দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

রুমানাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন রাস্তা ছেড়ে দক্ষিণ প্লাজার বাগানে উঠল তখন সোহানের মনে হলো, বাগানের মাটির উপর জন্মানো ঘাসগুলো ওদের আগমন বার্তা পেয়ে আগে থেকেই নিজেদের ছেঁটেছাঁটে সুন্দর করে তুলেছে। সমতল জমিনের উপর যেন ছোট করে ছাঁটা সবুজের কার্পেট। আশপাশের গাছের ডাল পালাগুলোও সুন্দর করে ছেঁটে পরিষ্কার করা হয়েছে। এও যেন ওদেরই জন্য।

একটা ঝাঁকড়া মত গাছের কাছে গিয়ে রুমান সবুজ কার্পেটে বসে পড়ে বলল, এখানেই বসি?

রুমানার কথায় নিজেকে ফিরে পেয়ে সোহান দেখল, গাছটার তলায় যেন একটা হুর বসে আছে। এতোক্ষণ এক সঙ্গে আছে অথচ খেয়ালই করেনি রুমানা যে আজ ওর প্রিয় রংয়ের কাপড় পড়ে এসেছে। স্টেপের উপর গাড় হলুদ রংয়ের স্যালোয়ার কামিজ। মাথায় একই রংয়ের বড় সুতির উড়না। যেন ঠিক গায়ে হলুদ দেয়া বউ বসে আছে। গোলগাল মুখ। মুখে টোল পড়া অপূর্ব হাসি যেন চারপাশ ভরিয়ে রেখেছে।

সোহানকে এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রুমানা মাথার উড়নাটা ঠিক করে নিয়ে বলল, কি দেখছেন?

তোমাকে।

আমাকে! আমাকে দেখার কি আছে? এর পূর্বে আমাকে কি আর দেখেন নি?

দেখেছি। তবে আজকের তুমি আর এর পূর্বের তুমির মধ্যে যে কতটা

অমিল তাই দেখছি।

আপনার কথার অর্থ বুঝলাম না।

না বুঝারই কথা। আমি নিজেই তো বুঝছি না।

কি?

তোমাকে।

কথাটা শুনার সঙ্গে সঙ্গে রুমানার ঠোঁটের কোনে বিদ্যুতের ন্যায় হাসি খেলে গেল। বলল, ঠিক আছে, মানলাম। তবে দয়া করে বসবেন না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলবেন?

রুমানা কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সোহান বাচ্চা ছেলের মতো ধপাস করে রুমানার সামনা সামনি বসে পড়ল। তারপর বলল, তোমার কথামত বসে পড়লাম এখন তোমাকেও আমার একটা কথা শুনতে হবে।

কি কথা?

ওদের কাছ থেকে একটু দূরে একটা গাছের ডালে পাশাপাশি বসে থাকা দুটো পাখিকে দেখিয়ে বলল, তোমার মনে আমাকে একটু জায়গা করে দিতে হবে। যেন ওদের মতো আমিও তোমার পাশাপাশি কাছাকাছি সব সময় থাকতে পারি। তোমাকে মন চাইলে দেখতে পাই চোখ জুড়িয়ে।

সোহানের ভালোবাসা মেশানো কথাগুলো শুনে রুমানার মনে পুলক খেলে গেল। মনে হলো যেন ওর দু'হাত ধরে বলে, তুমি ওভাবে বলছ কেন? আমি তো তোমারই। তুমি ডাকলেই সারোস পাখির মতো উড়ে চলে আসব তোমার কাছে।

মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, শুনুন, এখন আপনাকে আমার ব্যাপারে কিছু কথা বলব, দয়া করে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং আমাকে ভুল না বুঝে বোঝার চেষ্টা করবেন।

কথাটা শুনে রুমানার দিকে তাকাতে আর একবার চমকাল সোহান। ওর সামনে এখন যে বসে আছে তা ওর সেই স্বপ্ন প্রিয়া নয়। এতো অন্য কেউ। ওর রুমানার মুখ তো এতো কঠিন নয়। তাহলে এ কে?

সোহানকে হা করে এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রুমানা আবার বলল, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?

রুমানার কথায় বাস্তবে ফিরে এসে সোহান বলল, বল কি বলতে চাচ্ছ?

আপনি আমাকে নিয়ে যা ভাবছেন আমার পক্ষে আপনার সেই ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব নয়।

কেন নয়?

আপনি আমার ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

ওটা জানা তো আমার প্রয়োজন নেই।

এখন আবেগের বশে বলছেন। যখন কঠিন বাস্তব আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে তখন কিন্তু আপনি বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারবেন না।

তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না।

আপনি কি জানেন আমি আমিনুল ভাইদের ঘরে আশ্রিতা?

জানি।

আপনি কি জানেন, আমার মা-বাবা, ভাই সবাই আছে কিন্তু আজ প্রায় পাঁচ বছর আমি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের সাথে দেখা করতে পারি না। আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি ওরা যেমন জানে না তেমনি আমিও জানি না ওরা বেঁচে আছে না মরে গেছে।

কথাটা শুনে সোহান মনের ভিতর একটা ধাক্কা খেল। সামলে নিয়ে বলল, তুমি কি মা-বাবার সাথে রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছ?

না।

তাহলে!

আমার দুর্ভাগ্য আমাকে ওদের কাছ থেকে চির দিনের জন্য সরিয়ে দিয়েছে। আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন আমার দুর্ভাগ্য আমাকে এভাবেই তাড়িয়ে বেড়াবে।

রুমানা এসব বলে কী বুঝাতে চাচ্ছে সোহান তা বুঝতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠে রুমানার একটা হাত নিজের দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, রুমানা জানি না তোমার ভিতর কী এমন সমস্যা লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমি সত্যি সত্যিই তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। তুমি বিশ্বাস করে, তুমি যত যাই বল না কেন তাতে করে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা এক চুল পরিমাণ কমবে না।

এ জন্যই আমার ভয়। আপনি আমার প্রতি বড় বেশি আস্থাশীল। আর সে জন্যই আমার ব্যাপারে আপনার সবকিছু সময় থাকতে জেনে নেয়া উচিত।

তুমি আমাকে কি বুঝাতে চাচ্ছ? সোহানের কথায় অস্থিরতা ফুটে উটল।

সোহানের হাত থেকে নিজের হাতটা মুক্ত করে নিয়ে উড়নায় নিজের চোখ মুছে নিয়ে বলল, আমি বরিশালের এক অজ পাড়াগায়ের এক দরিদ্র দিন

মজুরের মেয়ে। যেখানে অভাবের স্থায়ী বাস। তারপরও আমাদের সেই ঘরে অভাবের সঙ্গে সুখ পাল্লা দিয়ে চলত। আমার বাবা লোকের জমিতে বা বাসায় সারাদিন শ্রম দিয়ে যা নিয়ে আসত তা দিয়েই আমরা পরম তৃপ্তিতে জীবন পার করে দিতাম। তার পর নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া চরম ট্রাজেডীগুলো এক এক করে বলে ডুকরে কেঁদে উঠে আবার বলল, আমার কিছুই নেই। আজ আমি নিঃস্ব, রিক্ত। শিকড়হীন পরগাছা। আপনাকে দেয়ার মত আজ আমার কাছে অবশিষ্ট কিছু নেই, যা আছে তা শুকিয়ে মরে যাওয়া গাছের বাকল ছাড়া আর কিছু নয়। আপনি যে ধরনের ছেলে। আপনার যে যোগ্যতা এবং আপনার সামাজিক যে মর্যাদা। আমার জীবনের সাথে নিজেকে জড়ালে আপনার সেই সব কিছু বৃদ্ধি পাওয়া তো দূরের কথা নিমিশে ধ্বংশ হয়ে যাবে। খড় কুটোর মতো উড়ে গিয়ে সেখানে স্থান করে নিবে জ্বালাময়ী যন্ত্রণা।

প্লিজ প্লিজ রুমানা তুমি থামো, তুমি চুপ কর। উত্তেজনার সঙ্গে প্রতিবাদ করে সোহান আবার বলল, তুমি ভেবে না আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করিনি। তুমি এও ভেবো না যে, আমি তোমাকে করুনা করছি বা সমাজের প্রতি আমার দায়িত্ব পালন করছি। তোমাকে ভালো লাগা ও ভালোবাসার ব্যাপারে কিছুক্ষণ আগে আমি যা বলেছি তোমার কথ শুনার পরও তা আবার রিপিট করছি, তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর আর নাই কর, তোমার সব কথা শোনার পর তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা বাড়া ছাড়া এক চুলও কমেনি।

তোমার জীবনে যা ঘটে গেছে আমার কাছে তা শুধুই একটা দুর্ঘটনা বই কিছুই না। পৃথিবীতে আজ প্রায় ছয়শ কোটিরও বেশি মানুষের বাস। এতো মানুষের মধ্যে দৈনিক তো দূরের কথা প্রতি মুহূর্তে কত হাজার, কত লক্ষ মানুষের জীবনে এমন দুর্ঘটনা ঘটছে তার কটার খবর আমরা জানতে পারি। আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি এবং মেনে চলতে চেষ্টা করি। আর সেটা হলো, সত্য ও মানবতাবোধ। তুমি আমার কাছে সত্য বলেছ আমি তা একশ ভাগ বিশ্বাসও করেছি। তাই বলে আমি আমার ভালোবাসার কাছ থেকে দূরে সরে যাব আমি সে রকম ছেলে নই। আমি যেমন তোমাকে নিঃশ্বার্থ ভাবে প্রথম দিনের দেখাতেই ভালোবেসে ফেলেছি। তেমনি সারা জীবন ভালোবেসে যাব।

আমি শুধু এতোটুকু অনুরোধ করব, তুমি যেন আমার প্রতি কখনো বিশ্বাস না হারাও। উপরে আল্লাহ নিচে আমি, তুমি দেখ আমি কখনই

আজকের পর তুমি না চাইলে তোমাকে তোমার অতীতের ব্যাপার নিয়ে কোনো রকম কৌতূহল দেখাব না। কেননা আমি ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী।

এতক্ষণ ধরে রুমানা সোহানের কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনছিল। আর চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছিল। সোহান কথা শেষ করতে দু'হাতে চোখের পানি মুছে নিয়ে বলে উঠল, কিন্তু আমি আমি আ...মি...। রুমানা কথাটা শেষ করতে পারল না। আবারও ডুকরে উঠল। কষ্টে যেন ওর বুকের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। বুকের উপর যেন দশমন বোঝা চেপে আছে। শ্বাস প্রশাসও যেন আর চলতে পারছে না স্বাভাবিক গতিতে।

বাঁচার জন্য কথা বলার জন্য শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধড়ফড় করে উঠে বিছানায় বসে বড় বড় করে শ্বাস নিতে নিতে দেখল পাশে প্রতিদিনকার মত নিজের প্রাণের মানুষটা নিঃশ্চিন্তায় বাচ্চা ছেলের মতো অঘরে ঘুমাচ্ছে। পূর্বাকাশে সূর্য নিজের অবস্থান প্রকাশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। চারপাশের অন্ধকারকে দূরে ঠেলে দিনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে চারপাশ। দূর আকাশে দলবেধে পাখিরা উড়ে চলেছে নিত্যদিনের কাজে। রুমানাও নিজের মন থেকে সব কিছু ঝেড়ে ফেলে নতুন দিনকে জীবনের নতুন অধ্যায় মনে করে আলিঙ্গন করে নিয়ে প্রতিদিনকার মত নিজেকে তৈরি করে নেয়।

এখন আর অতীত চিন্তার সময় ওর নেই। এখন আর নিজেকে নিয়ে চিন্তার সময় ও নেই। এখন সময় ওদের। নিজের দু'সন্তান স্নেহা ও নেহার।